বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র

৪ঠা—৬ই এপ্রিল '৭৬

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার, ১৯৭৬

www.pathagar.com

● শিক্ষার মান

● শিক্ষার পরিবেশ

সেমিনারের উদ্বোধনী বক্তৃতামালা, পঠিত প্রবন্ধাবলী, আলোচনা ও প্যানেল সুপারিশের সংকলন।

www.pathagar.com

প্রকাশনায় :

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে
সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন

প্রকাশকাল :

জানুয়ারী, ১৯৭৮

সংকলন ও সম্পাদনায় :

সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন
আবু জায়েদ শিকদার
হোসনে আরা শাহেদ
মাহবুবুল আলম

প্রচ্ছদ :

কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ ও বাঁধাই :

কথাকলি প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস, ঢাকা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সম্ভাবনার উপযুক্ত প্রতিফলন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় নব রূপায়নের নানা প্রসংগ নিয়ে বিবেচনা ও পুনর্বিবেচনা চলছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ কি হওয়া উচিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও তার বিস্তৃত পর্যালোচনা আছে।

নানা চিন্তা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং সংকট উত্তরণের পথ সন্ধানের জন্য "জাতীয় শিক্ষা সেমিনার—৭৬'-এর আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায় থেকে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার মান ও পরিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রবন্ধে এবং আলোচনায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান রূপ বিশ্লেষণ করা হয় এবং শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

বর্তমান গ্রন্থে সে সব প্রবন্ধ, আলোচনা সুপারিশসমূহ গ্রথিত হলো। আশা করি এই গ্রন্থে বিধৃত মতামতসমূহ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ও পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

কজলুল হালিম চৌধুরী
উপচার্য,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংকলন প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার মান ও পরিবেশ সম্পর্কে ১৯৭৬ সনের ৪ঠা হতে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এই সেমিনারের প্রধান বৈশিষ্ট-প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রশাসনিক দফতরের ডেলিগেটবৃন্দের সেমিনারে অংশগ্রহণ। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দের সম্মিলিত এই ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠান এই প্রথম। জেলা ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রশাসন থেকে ডেলিগেট নির্বাচন করা হয়। সেমিনারে মোট তিনশ' ছিয়াশী জন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করেন; মফস্বল থেকে আগত ডেলিগেটের সংখ্যা ছিল দু'শ ছত্রিশ জন। এছাড়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে শিক্ষার মান ও পরিবেশ, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে মোট ছয়টি প্রবন্ধ পাঠ এবং পঠিত প্রবন্ধের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেমিনারে প্যানেল আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। সেমিনারে আগত ডেলিগেটবৃন্দকে পনেরটি প্যানেলে ভাগ করা হয়। তাঁরা নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে মূল্যবান সুপারিশ রাখেন। সুপারিশসমূহ সেমিনারের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত হয়।

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধের ওপর আলোচনা এবং প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশসমূহে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত

www.pathagar.com

সমস্যাবলীর সমাধানের পথ নির্দেশ রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা প্রশাসকগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এই সঙ্কলন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষার মান এবং শিক্ষার পরিবেশ এই দুইটি বিষয় একের সঙ্গে অপরটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পঠিত প্রবন্ধে, আলোচনায় এবং সুপারিশে অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয় ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

শিক্ষা সমস্যা সর্বদেশ ও সর্বকালে এক নয় এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাথে তার সমস্যাবলীরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু প্রতিনিয়তই যাঁরা এ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁদের সকলের সমবেত চিন্তা-ভাবনা-বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যেই খুঁজতে হবে সমস্যা সমাধানের ইংগিত, এই ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে এই সেমিনারের সকল অধিবেশনে। সুতরাং সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, আলোচনা ও সুপারিশসমূহ শিক্ষাঙ্গণে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

এই সঙ্কলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেমিনার সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, সুতরাং এর মূল কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এই কাজে প্রকৃতপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জনাব আবু জায়েদ শিকদার এবং তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন জনাব মাহবুবুল আলম ও মিসেস হোসনে আরা শাহেদ। সঙ্কলন সম্পাদনা ও প্রকাশনায় তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন,
সদস্য-সচিব,
জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটি ও
কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা, ৩০ ১. ৭৮

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১।	**উদ্বোধনী বক্তৃতামালা**	**পৃষ্ঠা**
	সাংগঠনিক কমিটির সভাপতির ভাষণ	৩
	উদ্বোধনী ভাষণ	৭
	জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতির ভাষণ	১২
	ধন্যবাদ জ্ঞাপন	১৯
২।	**প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা**	
	মাধ্যমিক শিক্ষার মান	২৩
	আলোচনা ঃ প্রথম অধিবেশন	৩৮
	কলেজ শিক্ষার মান	৪১
	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান	৫৩
	আলোচনা ঃ দ্বিতীয় অধিবেশন	৬৭
	মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ	৭২
	আলোচনা ঃ তৃতীয় অধিবেশন	৮৬
	কলেজ শিক্ষার পরিবেশ	৮৯
	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ	১০৭
	আলোচনা ঃ চতুর্থ অধিবেশন	১১৭
৩।	**প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশ**	
	(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, গবেষণা, পাঠক্রম, পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১২৫
	(২) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি	১৩১
	(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি	১৩৪
	(৪) কলেজে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১৩৭

www.pathagar.com

(৫) কলেজে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি ১৪১
(৬) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, ও অন্যান্য সরঞ্জাম ১৪৪
(৭) মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি ১৫০
(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি ১৫৫
(৯) কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি ১৬০
(১০) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি ১৬৪
(১১) শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ১৬৭
(১২) শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রয়োজনীয়তা ১৭০
(১৩) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ১৭৩
(১৪) শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ভূমিকা ১৭৬
(১৫) প্রাথমিক শিক্ষার মান ও পরিবেশ ১৭৯

৪। সমাপ্তি অধিবেশন ও সুপারিশসমূহের সারসংক্ষেপ

সমাপ্তি অধিবেশনের কার্যবিবরণী ১৮৫
সুপারিশসমূহের সারসংক্ষেপ ১৮৭

৫। পরিশিষ্ট

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটি ২০১
জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটি ২০১
অনুষ্ঠানসূচী ২০২
ব্যবস্থাপনা সহযোগী ২০৬
ডেলিগেটবৃন্দের তালিকা ২০৭

www.pathagar.com

১
উদ্বোধনী বক্তৃতামালা

- **সাংগঠনিক কমিটির সভাপতির ভাষণ**

  অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী,
  ভাইস-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

- **উদ্বোধনী ভাষণ**

  রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

- **জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতির ভাষণ**

  অধ্যাপক আবুল ফজল.
  রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

- **ধন্যবাদ জ্ঞাপন**

  সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন.
  সদস্য সচিব, সাংগঠনিক কমিটি ও কলেজ
  পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাংগঠনিক কমিটির সভাপতির ভাষণ

অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী
ভাইস-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামান্য রাষ্টপতি বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মাননীয় অধ্যাপক আবুল ফজল, শ্রদ্ধাভাজন ডেলিগেটবৃন্দ, ও সুধীবৃন্দ,

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর বহু কর্মব্যস্ততা সত্তেও এই সেমিনার উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন। আজকে তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত ও আনন্দিত। তাঁর উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে, তাঁর অভিভাষণ শিক্ষা জগতের কর্মপ্রবাহে নূতন উদ্যমে আত্মনিয়োগ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, দেশের বিশিষ্ট ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল আজ আমাদের মাঝে রয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতি হিসেবে এই সেমিনার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রেরণা ও অবদান অসাধারণ। তাঁকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই শিক্ষা সেমিনারে যোগদান করতে এসেছেন; দূরাঞ্চল থেকেও অনেকে এসেছেন। তাঁদের সকলকে এই কষ্ট স্বীকার করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই ধরনের একটি সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ উপলব্ধি করে আসছি। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য

www.pathagar.com

হিসেবে বহু শিক্ষাবিদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আমি একটি আলোচনায় মিলিত হই। সেই সভাতেও একটি বিস্তারিত শিক্ষা সেমিনারের গুরুত্ব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমি তখন একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই তিনদিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৬-এর বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হবে মূল দুটি প্রসঙ্গেঃ (১) শিক্ষার মান ও (২) শিক্ষার পরিবেশ।

একথা আপনারা সকলেই জানেন যে, আমাদের শিক্ষার মান আজ সর্বত্র আশানুরূপ নয়। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে এবং সে সব কারণও আপনাদের অবিদিত নয়। গুণগত উৎকর্ষ ব্যতীত শিক্ষা তাৎপর্যহীন। এবং এক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে দরকার।

বলাবাহুল্য, শিক্ষাঙ্গণে আজ সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব রয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়—এ সম্পর্কে তর্কের কোন অবকাশ নেই। শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ কেন বিঘ্নিত হচ্ছে, সে প্রশ্নে না গিয়ে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপাদানগুলি আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ বহুলাংশে শিক্ষার্থীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একজন শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গণে প্রবেশ করে—জ্ঞান লাভ, মানসিক উন্নতি এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের উপযোগী পাঠক্রম, পাঠক্রম সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা কতটুকু পায়, তা বিচার করে দেখতে হবে। সে শুধু বিদ্যার্থী নয়, সমাজেরও একজন সদস্য। অতএব সে শিক্ষাঙ্গণের বাইরের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবমুক্ত নয়—এ কথাও মনে রাখতে হবে। সুতরাং পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব শুধু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর নয়, সমাজের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও রয়েছে। শিক্ষাঙ্গণে পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণ প্রধান ভূমিকা পালন করবেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে বৃহত্তর সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। মূল্যবোধ ও আদর্শের যে শিক্ষা শিক্ষক ছাত্রকে দেবেন, সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন ব্যতীত তা হবে ব্যর্থ ও অর্থহীন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়—

www.pathagar.com

এক কথায় সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই আমরা সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারি।

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গণে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদগণ যাতে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন সেজন্যে এই সেমিনার তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে উদ্বোধনী অধিবেশনে শিক্ষার মান ও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাবলী, আলোচনার ক্ষেত্রসমূহ এবং মূল বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা হবে এবং শেষ পর্যায়ে ঐ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার ভিত্তিতে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সেমিনার সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল আলোচনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এর কারণ আমরা শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে কার্যকরী এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ কলেজ ও স্কুলসমূহে—বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, আমি কিছু বাস্তব কথা আপনাদের বলতে চাই।

বেসরকারী কলেজ একত্রীকরণ কমিটির সভাপতি হিসেবে বেসরকারী কলেজসমূহের দুরবস্থা অবলোকন করার সুযোগ আমার হয়েছে। এই ঢাকা শহরেই এমন কলেজ আছে যার শিক্ষকের বেতন মাসিক ১৫০ টাকা এবং সে বেতনও অনিয়মিত। এখন ঐ শিক্ষকের কাছে আপনারা কি মানের শিক্ষাদান আশা করতে পারেন? কলেজে কোনো বইপত্র নেই। ছাত্রের সংখ্যা—রোলে আট শতের ঊর্ধ্বে কিন্তু উপস্থিতি এক শতের নীচে। এখানে কি শিক্ষার পরিবেশ আপনারা খুঁজবেন? দেশের সর্বত্র এ ধরনের বেসরকারী কলেজেরইতো সংখ্যাধিক্য। একত্রীকরণের ফলেই যে এই সমস্যার সমাধান হবে, আমি তা মনে করি না। দেশের মধ্যে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রেখে আমরা আমাদের তরুণ সমাজের এক বিরাট অংশকে চিরতরে পঙ্গু করে ফেলছি। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বেসরকারী কলেজগুলিতে ব্যাপক সরকারী অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। আমার মতে একত্রীকরণের পর বেসরকারী কলেজের ব্যয়ভার স্থানীয় জনগণের উপর শতকরা ৩০ ভাগ ন্যস্ত করে বাকি শতকরা ৭০ ভাগ সরকারকে বহন করতে হবে।

আমাদের দেশে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে অবহেলিত। শিক্ষার মান ও পরিবেশ উভয়ই স্কুল পর্যায়ে সন্তোষজনক নয়। এর নানাবিধ কারণ আছে। সম্প্রতি প্রাথমিক স্কুলসমূহকে সরকারী আওতাধীনে আনা

www.pathagar.com

উপযুক্ত পদক্ষেপ হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্কুলসমূহকে এক অর্থে 'অভিভাবকহীন' বলা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' আছে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ৩৮,০০০ এবং মাধ্যমিক স্তরের ৮,০০০ স্কুলের জন্য অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। এর ফলে দেখা যায় যে, বৎসরের শেষে সরকারী তহবিলে স্কুলখাতের টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। তখন সেই টাকা, অনেক বেশী প্রভাবশালী 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের চাপে, বিশ্ববিদ্যালয় খাতের ঘাটতি পূরণের জন্য পুনর্বন্টন করা হয়। এ অবস্থার অবসান করতে হলে, প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের' সম-ক্ষমতাসম্পন্ন স্কুলসমূহের অর্থ মঞ্জুরী নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বা কমিশন প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় অবশ্যই গুণগত উৎকর্ষের উপর জোর দিতে হবে। বলাবাহুল্য স্কুল ও কলেজের শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গুণগত মান।

উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রথম—প্রাথমিক শিক্ষা হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত—সকল পর্যায়ের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসকদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এক অবিচ্ছিন্ন ধরায় আমাদের সাধনা প্রবাহিত না হলে সত্যিকার এবং সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য জাতির সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন। দেশের সার্বিক উন্নতিকল্পে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও প্রশাসনে সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে সৃজনী প্রতিভার। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠক্রম, শিক্ষার আনুষঙ্গিক সব কিছুই এমন হতে হবে যাতে করে দেশের তরুণেরা কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হয়ে নিজেদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং দেশের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহশীল ও সক্ষম হয়। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর। আমি বিশ্বাস করি সমস্যার গুরুত্ব ও সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারা সম্পূর্ণ সচেতন।

আপনাদের পুনরায় আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় শিক্ষা সেমিনার উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

উদ্বোধনী ভাষণ

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম

জনাব সভাপতি ও সমবেত সুধীবৃন্দ,

জাতি তার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে আজ যখন নতুন দিক-দর্শন লাভ করেছে সেই মুহূর্তে "জাতীয় শিক্ষা সেমিনার" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই সেমিনার আয়োজন করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় "শিক্ষার মান ও পরিবেশ" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকবৃন্দ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে সমাজ জীবন, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গণ, স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত থাকতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ সমাজ জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে তা শিক্ষার পরিবেশকে দুঃখজনকভাবে কলুষিত করে। এই প্রেক্ষিতে, শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা শুধু শিক্ষাঙ্গণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ ও পরিবারের ভূমিকাসহ একে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ—"আশরাফুল মাখলুকাত"। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জ্ঞানই হচ্ছে তার প্রধান হাতিয়ার। জ্ঞান অর্জন এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার দুটি প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞান অর্জনের সাথে মূল্যবোধের সৃষ্টি যদি না হয়, তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জ্ঞানের বিপজ্জনক ব্যবহারের অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং জ্ঞানকে যদি শিক্ষার কলেবর বলা যায়, তবে মূল্যবোধকে বলতে হবে শিক্ষার আত্মা। অর্জিত জ্ঞানকে মূল্যবোধে সিঞ্চিত করতে না শিখলে সে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। তাই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

সমাজ জীবনে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা যেমন বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর, কারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ অপরিহার্য। শিক্ষার উচ্চমান ও পরিবেশ নিশ্চিত করার স্বার্থে শিক্ষাঙ্গণে যে কোন মূল্যে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন, বিশেষ করে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সমস্ত কলুষতার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। এর পবিত্রতা রক্ষা এবং ছাত্র সমাজের নিরবিচ্ছন্ন অধ্যয়ন ও সাধনার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ ন্যায়সঙ্গতভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না বলে আমরা আশা করি। এ বিষয়ে ছাত্র সমাজ নিজেদেরই স্বার্থে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এই প্রেক্ষিতে আপনারা যাঁরা শিক্ষকতার মহান ব্রতে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের অপরিসীম দায়িত্বের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। একজন শিক্ষার্থী শৈশব থেকে তার শিক্ষার শেষ পর্যায় পর্যন্ত মূলতঃ আপনাদেরই সাহচর্যে গড়ে উঠে। আপনাদেরই প্রদত্ত শিক্ষা ও পথ নির্দেশের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের নাগরিক অর্থাৎ আমাদের জাতির রূপ ও প্রকৃতি। শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যে শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রয়োজন তার সৃষ্টি বহুলাংশে আপনাদের উপরই নির্ভরশীল। নির্ধারিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়াও একটি ছাত্রের প্রয়োজন তার শিক্ষকের আন্তরিক সাহচর্য। আমাদের যুব সমাজের চিন্তাধারা এবং তাদের মানসিকতার সুস্থ বিকাশের জন্য প্রয়োজন তাদের সমস্যা ও চাহিদাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের এই সংকটকালে মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করে পথ নির্দেশ দান করা। এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরকে গভীরভাবে জানা, তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ ও নির্ভরশীলতা জাগিয়ে তোলা। শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশকে প্রাণহীন না করে প্রাণময় করে তুলতে হবে। "শিক্ষক সমাজ প্রলোভন বা যে কোন কলুষতা সম্পর্কিত সন্দেহের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে"—শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থী ও সমাজের এই আস্থা যে কোন মূল্যে বজায় রাখতে হবে।

সততা ও ন্যায় সম্পর্কে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে সচেতন করতে হবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি। নীতিবোধ সম্পর্কিত শিক্ষা এবং মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে। এ বিষয়ে আমাদের শিশুদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুস্তক সহজলভ্য করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন শিশু সাহিত্য প্রকাশনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা পরিমাগত বা **Quantitative** না হয়ে গুণগত বা **Qualitative** হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিমাণগত শিক্ষা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষিত বেকার সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। এই জন্য কারিগরি শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা অবশ্যই প্রয়োজন। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কি উপায়ে উৎসাহ প্রদান করা যায় তা নির্ণয় করতে হবে। এছাড়া, আর্থিক বা অন্য কোন কারণে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে তা রোধ করা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষাক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা আগে কয়েকবার উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে আবার বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আপনারা জানেন যে, এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা, প্রাথমিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা উৎসাহিত করা এবং আমাদের দেশের চাহিদা ও বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নিরিখে একটি বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা। মনে রাখতে হবে, শৃঙ্খলা, শ্রমের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবনের বাস্তবতা ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য না থাকলে শিক্ষা জীবনকে মানুষ হিসেবে উন্নত করতে পারে না। বিশেষ করে আমাদের পল্লী অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সংযোগ থাকলে সে শিক্ষা শুধু দেশ ও জীবন সম্পর্কেই জ্ঞান দান করে না ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের তথা পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার বাস্তব সমাধানেও সহায়ক হয়। একইভাবে শহর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন অপরিহার্য। খুবই আশার কথা, আমাদের শহরের ছাত্র-ছাত্রীরাও দেশ ও মাটিকে জানার জন্য আজ সময় ও সুযোগমত মাঠে নামছেন। তাদের এই উৎসাহ আরও ব্যাপক হবে এবং নিজের দেশ ও জীবন সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞানলাভ করবেন বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মাধ্যমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আমাদের দেশ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করার জন্য যেমন যত্নবান হতে হবে, অপরদিকে শিক্ষার মাধ্যম এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পর্কে কোন অবহেলার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার গতিশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য আপনাদের ও বিভিন্ন প্রতি-

www.pathagar.com

ষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি স্বাধীন, সংস্কৃতিবান, উন্নয়নকামী ও প্রগতিশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও পটভূমি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমাদের অবহিত থাকা অপরিহার্য। এই প্রয়োজনেই আমাদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য বহির্বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারে আমাদের অবাধ বিচরণ ব্যাহত না হয়। রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষা, জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেও তা বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। এ কারণেই বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের বহু যুগের পরিচয়ের প্রেক্ষিতে আমাদের স্বার্থে এই সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তা কোন মতেই বাংলা ভাষার শিক্ষা, প্রচলন ও ব্যবহারের পরিপন্থী হিসেবে নয়। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, প্রশাসনসহ ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ব্যবহারে ঐকা-ন্তিকভাবে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে।

সম্প্রতি সরকার ছাত্রদের আবাসিক সুবিধাসহ তাঁদের খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধির প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনসহ নানা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বহু-মুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। সরকার সাধ্যমত এসব সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী।

শিক্ষার পরিবেশ গঠনের যে কোন উদ্যোগে পরিবারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীর ওপর তার পরিবারের প্রভাব অপরিসীম। জীবনের গঠনমূলক পর্যায়ে তাকে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সাহচর্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে হয়। শৈশব থেকেই ভাল ও মন্দ সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞানলাভ হয় পরিবারের আওতায়। শিক্ষা অঙ্গনের নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত জ্ঞানের এবং দেশ ও সমাজসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ পরি-বারের আওতায় যতখানি সম্ভব তা অন্য কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। এই প্রেক্ষিতে অভিভাবক বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহচর্য শিক্ষার্থীর দায়িত্বজ্ঞান, মানসিক উৎকর্ষ, মূল্যবোধ ও আকাঙ্খিত পরি-বেশের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েই কোন অভিভাবক তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত কোন ছাত্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে

www.pathagar.com

দেখা যায় যে বিপথগামী হওয়ার জন্যে তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশই মূলতঃ দায়ী। একজন শিক্ষকের যেমন প্রয়োজন তাঁর ছাত্রের অভিভাবক ও পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, একইভাবে অভিভাবকেরও প্রয়োজন তাঁর সন্তানের শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক বা সম্মিলনীর আয়োজন করা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুলের জন্য অপরিহার্য। এই উদ্যোগ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু সমস্যা রয়েছে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সমস্যাবিহীন নয়। সরকার শুধু সমস্যার পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, আমাদের সীমিত সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে আমরা বিশেষভাবে সচেষ্ট। আপনারা যাঁরা ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও আমরা সচেতন ও সহানুভূতিশীল। বেসরকারী কলেজের সমস্যা সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট আমাদের বিবেচনাধীন রয়েছে। অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আপনারাসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন গোটা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনারা জানেন যে, সরকার মৌলিক সমস্যাসমূহের একটির পর একটি পর্যালোচনা করে সেগুলোর সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

শিক্ষার মান, বিশেষভাবে সুষ্ঠু পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। আপনারা শিক্ষার উচ্চতম স্তর থেকে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত এই সমস্যার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত। শিক্ষাঙ্গণের প্রাণ ও পবিত্রতার ওপর জাতির প্রাণ ও পবিত্রতা নির্ভর করে। আমি আশা করি, আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সেমিনারে বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শিক্ষাঙ্গণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, এর পবিত্রতা রক্ষা এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

পরিশেষে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতির ভাষণ ঃ

অধ্যাপক আবুল ফজল
রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, বিশেষতঃএ পরিবর্তিত পরিবেশে তা মোটামুটিভাবে সব শিক্ষাবিদদেরই জানা। আজকের এ সেমিনারের প্রধান লক্ষ্য সেসব সমস্যার সমাধানের পথ ও উপায় খুঁজে দেখা। শিক্ষা একটি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার, এর সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সময়ের প্রয়োজন—অধিকন্তু শিক্ষা গুণগত অর্থাৎ **Qualitative** না হলে স্রেফ পরিমাণগত তথা **Quantitative** করতে গেলে শিক্ষার যে আসল উদ্দেশ্য সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য নাগরিক তৈরী করা, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে ব্যর্থতার নজির আমাদের দেশে আজ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাই দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ মাত্রই এখন অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েছেন। উপস্থিত আপনারা সবাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, অনেকের জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়—স্বভাবতঃই দেশ এ ক্ষেত্রে আপনাদের কাছ থেকে কিছু আলোর দিগদর্শন পেতে চায়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যা সে শুধু আর্থিক সমস্যা নয়, আমার বিশ্বাস প্রধানতম সমস্যা মানসিক মনোভাবের, দৃষ্টিভংগীর। 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে' শতাব্দী পূর্বে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল, তা থেকেই এ মনোভাবের সৃষ্টি, আর তা তখন হয়তো সত্যওছিল। অন্ততঃ আংশিকভাবে যে সত্য ছিল আমাদের সামাজিক ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রয়েছে।

আজকের দিনে অবস্থা আর ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ; কিন্তু আমাদের তথা সমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেনি আদৌ। আজো সে গাড়ী-ঘোড়ার মনোভাবই সমাজের সর্বত্রই সক্রিয়। শতাব্দী পূর্বের সে স্বপ্ন থেকে আজো আমরা মুক্তি পাইনি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে থাকি একটি ধোপদুরস্ত জীবনের স্বপ্ন সামনে রেখে, তারাও স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত এ স্বপ্নটাই পালন করে থাকে। তার পরই শুরু হয়

www.pathagar.com

স্বপ্নভংগ—শুরু হয় হতাশা, নৈরাশ্য এবং শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত জন-শক্তির বিপুল অপচয়। ইতিহাসের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সে সঙ্গে জনসংখ্যার বিরাট বিবর্তনের ফলে গাড়ী-ঘোড়া কিম্বা ধোপদুরস্ত জীবনের স্বপ্ন কবেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার ধারা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—এক কথায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোভাবের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্র আর বাস্তব জীবনের মধ্যে এক বিরাট সামুদ্রিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলেই যতসব সমস্যার উদ্ভব। এ ব্যবধান বা ফাঁক দূর করতে না পারলে—আমার বিশ্বাস, কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষাখাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ কিম্বা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি—এগুলো গৌণ ব্যাপার—গৌণ ব্যাপার এ কারণে যে, এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা কিছুসংখ্যক শিক্ষকের কিছুটা অভাব মোচন হতে পারে সত্য; কিন্তু এতে ত ফাঁক পূরণ হবে না। সার্বিক সমস্যার সমাধান এতে ঘটতে পারে না। এ স্রেফ ছেঁড়া কাপড়ে তালি দেওয়া।

সব বিদ্যা বা জ্ঞানের দু'টি দিক—মানসিক আর ব্যবহারিক। এ দু'য়ের সমন্বয়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিহিত। পদার্থ বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না; কিন্তু আমাদেশে এ বিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এত সীমিত যে, আমি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছেলেদেরও বেসরকারী স্কুল কলেজে দেড়শ', দু'শ টাকায় মাষ্টারি করতে দেখেছি। বিদ্যার অপচয়ের কথা বাদ দিলেও, এমন ছেলের মানসিক হতাশার কথা ভাবতেও দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ তো দুঃখই, তাতে তো কোন প্রতিকার হয় না।

পরিসংখ্যান ভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় কিছুতেই রোধ করা যাবে না। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। একটা ছেলে-মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দিতে শুধু রাষ্ট্রের নয়, তার অভিভাবকদেরও এক বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। তার পরেও সে যদি তার পরিবার বা সমাজ, কি দেশকে কিছুই দিতে না পারে এবং নিজের জীবিকা অর্জনেও হয় ব্যর্থ, তাহলে তার হতাশাটা কতভাবে, কতদিকে সংক্রমিত হয়ে কত রকম অনর্থের কারণ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

বাঁচার প্রধান শর্ত বলে যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবিকার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার না দিয়ে উপায় নেই, তার সঙ্গে তাল বা সমতা রেখেই সব রকম শিক্ষা পদ্ধতি আর পাঠক্রম রচনা করতে হবে। তা না হলে শিক্ষিত বেকার সব সময় বিপজ্জনক। আমরা দ্রুত এ বিপজ্জনক পরিস্থিতির

www.pathagar.com

সম্মুখীন হতে চলেছি। আপনাদের আলোচনার এটি একটি প্রধান বিষয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। মেধা, প্রবণতা আর জীবিকা তথা employment-এর সুযোগ-সুবিধা আর তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চ শিক্ষাকে নির্বাচিত তথা selective করাই বোধ করি অধিকতর যুক্তি সংগত, বহু দেশে তা করা হয়েছে। এ বিষয়েও সরকার আপনাদের সুপারিশ কামনা করে।

প্রাইমারী থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ক্রমাগতই ধাপে ধাপে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে অর্থাৎ যাদেরে ড্রপ-আউট বলে তার সংখ্যা বেড়ে চলে। মোট ছাত্র সংখ্যার এক বিরাট অংশ এ ড্রপ-আউট, এরা অনেক ক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করে না বা করতে পারে না। যদি প্রাথমিক স্তর থেকে আমরা কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে মাঝ পথে স্কুল-কলেজ ত্যাগী ছাত্রদের রোজগারের পথ কিছুটা অন্ততঃ খুলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। যে কোন রাজমিস্ত্রী, সুতার মিস্ত্রী বহু গ্র্যাজুয়েট থেকে বেশী রোজগার করে থাকে আজকাল। তবে সাদা কলারের জীবনের মোহ ত্যাগ করতে না পারলে তেমন জীবনের দিকে কেউই ঝুঁকবে না। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এখন এ ধরনের স্বল্প শিক্ষিত কারিগরের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কারিগরি বিদ্যায় রপ্তদের জন্য রোজগারের এন্তার দরজা খুলে গেছে।

আমাদের দেশ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক, আমাদের প্রধান জীবিকা কৃষি, বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অংশও আমাদের কৃষিজাত সম্পদ থেকেই আসে। আমাদের শিক্ষার সর্বস্তরে কৃষি বিদ্যার একটা স্থান থাকা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগই আসে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যতই সামান্য হোক এসব পরিবারের কিছু না কিছু জায়গা-জমি থাকে, কিছুটা আধুনিক কৃষিবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় থাকলে অনেক ড্রপ-আউট-এর জীবন বেকারীতে নিঃশেষিত হবে না, যদি কায়িক পরিশ্রমকে তারা ঘৃণা না করে।

ফারাক্কা বাঁধ আমাদের বেশ কয়েকটি জেলায় নানা রকম সংকটের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে। ইদানীং এটি একটি আমাদের জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সমস্যা নয়, এ এক বিরাট সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সংকটের মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। কারণ এর সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সম্পর্ক। প্রয়োজনীয় জলাভাবে আমাদের বহু শস্যভূমি অনাবাদী থেকে যাবে। বহু জেলার শিরা উপ-শিরারূপী নদ-নদীর পানিতে বেড়ে যাবে লবণাক্ততা, ইতিমধ্যেই নাকি বেড়ে গেছে সার্বিকভাবে। এসবের ফলে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা যে খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছি তার

www.pathagar.com

সাফল্যও এর ফলে বিঘ্নিত হবে। তবে ইতিহাসের ধাপে ধাপে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে। সেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমরা করেছি এবং তাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছি। ফারাক্কাও আজ আমাদের সামনে তেমন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবেই এসেছে।

কাজেই ধরে নিতে হবে আমাদের ঘর আমাদেরই সামলাতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখন থেকেই না নেয়া হলে আমাদের অর্থনীতিতে ভাংগন ধরবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দেশের বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোকে কাজে লাগানো যায়—এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাদের দিতে হবে নেতৃত্ব। মোট কথা এ চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, আমার বিশ্বাস অন্যান্য চ্যালেঞ্জের বেলায় আমরা যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি, এবারও আমরা সেভাবে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবো, যদি মনোবল আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। আমরা পরাজিত হতে চাই না, আমাদের প্রকৌশল বিজ্ঞানীরা পরাজয়ের মনোভাব ত্যাগ করে সাহসের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এগিয়ে আসুন, এ অনুরোধ তাঁদের কাছে সবিনয়ে রাখলাম।

শিক্ষার মান আর পরিবেশের যে দ্রুত অবনতি ঘটেছে এ বিষয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের সমূহ ক্ষতি যে হবে তাতেও দ্বিমত থাকার কথা নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরে দেশে যথাযথ শিক্ষিত সুযোগ্য নাগরিকের অভাব দেখা দেবে। যাঁরা এখন কোন না কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত তাঁরা ইতিমধ্যেই এ অভাব মনে মনে বুঝতে পারছেন। লোক নির্বাচন ও নিয়োগের সময় এ অভাব আপনাদের সামনে কি সংকটের সৃষ্টি করে তা আপনাদের কারো অজানা নয়। এ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ আমরা, সমাজ নেতারাই দায়ী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুশৃংখল পরিবেশ থেকে আমরাই ছাত্রদের রাজনীতির নৈরাজ্যের দিকে টেনে এনেছি। একদিন দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র-ছাত্রীদেরও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রয়োজন হয়তো ছিল, এখন তো আর সে প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ শেষে সৈনিকদের যেমন ব্যারাকে ফিরে যেতে হয় তেমনি জাতীয় সংগ্রাম শেষে ছাত্রদেরও তাদের শিক্ষাংগণের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। রাষ্ট্র থাকলেই রাজনীতি থাকবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রাজনীতি নানা কারণে আঁকা-বাঁকা পথে পরিচালিত হয়েছে। যখনই কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাক সংগে সংগে তাঁরা একটি বশংবদ ষ্টুডেন্ট উইং বা ছাত্র শাখাও দাঁড় করান। শেষোক্তদের একমাত্র কাজ মূল রাজনৈতিক দলের বা ঐ দলের নেতাদের হয়ে পাখা ঝাপটানো। ছাত্র বয়সে সবাই বেখেয়ালী ও আবেগ প্রবণ থাকে আর নিজের জীবিকা নিজেকে রোজগার করতে হয় না বলে এ কাজে তাদেরে অতি সহজেই পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে এমন কোন রাজনৈতিক দল আজো গজায়নি যার একটা না একটা ছাত্র শাখা নেই। রাজনীতি প্রায় মদের মতোই উত্তেজক, ঐ উত্তেজক বস্তুর প্রতি আবেগপ্রবণ ছাত্রদের প্রলুব্ধ করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।তদুপরি চোখের সামনে তারা দেখতে পায় এ ধরনের পাখা ঝাপটানো রাজনীতি করেই অনেকে নেতা হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, হয়েছেন ক্ষমতাসীন, হয়েছেন বাড়ী-গাড়ীর মালিক। ফলে সামান্যতেই অনেকে এ প্রলোভনের শিকার হয়ে নিজের বা অপরের জন্য পাখা ঝাপটাতে থাকে। শিক্ষাঙ্গণে আমরা যে এখন নৈরাজ্য দেখতে পাই তার মূল উৎসতো এখানেই। এ অবস্থার জন্য ছাত্ররা যত না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী দায়িত্বহীন তথাকথিত জননেতারা, রাজনীতিকে যাঁরা নিজেদের পেশা হিসেবে নিয়ে থাকেন। রাজনীতি তো একটি বিদ্যা—বিজ্ঞানও বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার বিজ্ঞান, যে বিদ্যা বা বিজ্ঞানের প্রধান পাঠ রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন আর তার মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন—এ সবের জন্য অধ্যয়ন দরকার, প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের রাজনীতিবিদদের এ সবের কোন বালাই নেই। তাই দেশে আমরা ভূরি ভূরি পলিটিশিয়ান দেখতে পাই। দেখতে পাই না একজনও রাজনীতিক তথা ষ্টেটসম্যান, পলিটিশিয়ানরা স্রেফ আন্দোলনমুখী রাজনীতিতেই বিশ্বাসী আর তাঁদের আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্যই তাঁরা ব্যবহার করেন ছাত্রদের।

যদি বলা হয় আমাদের দেশে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দীর পরে একজনও ষ্টেটসম্যান-এর আবির্ভাব ঘটেনি, তাহলে কি মিথ্যা বলা হবে? ছাত্র ও যুব সমাজকে আমরা নানাভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছি. কিন্তু এদের সামনে কোন রকম সুষ্ঠু ও সুস্থ নেতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করতে পারিনি। তাই এককভাবে এ অবস্থার জন্য ছাত্রদের দায়ী করা উচিত হবে না। তারাও তো আমাদের সামগ্রিক সমাজ দেহেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ। আমাদের শিক্ষাঙ্গণে সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশ—আসমান থেকে ফেরেশতারা নেমে এসে তা সৃষ্টি করবে না। আমাদেরই তা করতে হবে—ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সরকার এ চারের যৌথ সমন্বয়েই তা করা সম্ভব। দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে রাজনৈতিক নেতাদেরও এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত। ব্যক্তিগত কিম্বা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করা থেকে তাঁরা বিরত থাকুন—তাঁদের প্রতি এটিই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। দলের চেয়ে দেশ অনেক বড়, জাতীয় স্বার্থ অনেক ঊর্ধ্বে।

এ ব্যাপারে অভিভাবকদের কি কোন দায়িত্ব নেই? তাঁরা কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন? সন্তানের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর পরিবারের ভাগ্যও কি বিজড়িত নয়? স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অরাজকতার সৃষ্টি হয়, শৃংখলা রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে, পড়াশোনায় বিঘ্ন

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় তখন তো অভিভাবকমন্ডলী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এগিয়ে আসে না? এগিয়ে এসেছেন, তেমন কথা আজো শোনা যায়নি। মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়, কোথাও স্কুলের প্রধান শিক্ষককে, কোথাও বা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যক্ষকে ছেলেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এমন অমানুষিক ঘটনায়ও অভিভাবকদের নির্লিপ্ত ভূমিকা কি এক চরম হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নয়? ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ুর এক অতি-ক্ষুদ্রাংশই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটে। বাকী জীবনটা তো তারা তাদের পরিবারে অভিভাবকদের সান্নিধ্যেই কাটায়। কাজেই তাঁদের ছেলে-মেয়ের উপর তাঁরা যতখানি প্রভাব খাটাতে পারেন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ততখানি পারার কথা নয়। নিজেদের ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে, তাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিভাবকদের আরো সচেতন, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। তাদের সহায়তা ও সমর্থন ছাড়া শুধু শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষাঙ্গণে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা বা রাখা সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের ভূমিকাকে আমি খাটো করে দেখতে চাই না—। শিক্ষাঙ্গণে সুস্থ পরিবেশ রচনায় তাদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বই কি। তবে এখন সব ছাত্র যেমন ছাত্রসুলভ ব্যবহার করে না, তেমনি শোনা যায় অনেক শিক্ষকও আদর্শ শিক্ষকসুলভ ব্যবহার করেন না, সেভাবে নিজেকে তৈয়ার করেন না,। ফলে এখানেও আর একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। আগে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক আরো নিবিড় ছিল, এখন সে সম্পর্কে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে আর তা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। শিক্ষাঙ্গণে অনুকূল পরিবেশ রচনায় সাম্প্রতিক কালে এও একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাধা দূর করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষকতাকে সব দেশেই আজো মহৎ পেশা বলে গণ্য করা হয়। এককালে আমাদের দেশেও তা করা হতো। স্বাধীনতার পর হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত সামাজিক বিবর্তনের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। যার ফলে আমাদের দেশে পুরোনো মূল্যবোধ আজ সব ধুলোয় লুন্ঠিত। আর্থিক আভিজাত্য আর রাজনৈতিক ক্ষমতার এক অসুস্থ পরিবেশ আমাদের সব ঐতিহ্য চেতনা আর মূল্যবোধকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সর্বত্র একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি পিতা-পুত্রে,মাতা-কন্যায়ও ফাঁক দেখা দিয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের ফাঁকটাও কোন ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষাঙ্গণ সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভু কিছু নয়—সামগ্রিকভাবে সমাজেরই তা এক অবিচ্ছেদ্য অংগ—সমাজের প্রয়োজন আর দাবীতেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক আমরা সবাই এ সমাজেই বাস করছি, এ সমাজের আলো-হাওয়ায় আমরা মানুষ, প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এ হাওয়ায়। এ সবের প্রভাব এড়িয়ে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ-দেহে সার্বিকভাবে যদি শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, শিক্ষাঙ্গণেও তা স্বাভাবিক নিয়মে, অনিবার্যভাবে ফিরে আসতে বাধ্য। আমাদের

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে গোড়া, বুনিয়াদ—এ বুনিয়াদ যদি শক্ত না হয় তাহলে কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে না। এখানেও এক বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আমরা মাতৃভাষাকে স্বীকার করে নিয়েছি, সেভাবে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব ছেলে-মেয়েরা যখন পরে চিকিৎসা কিংবা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, কিংবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তারা কিছুতেই ঐ ফাঁকটা লাফ দিয়ে পারহতে পারে না। ফলে ঐ সব বিদ্যার অভ্যন্তরে ওরা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়, এদের জ্ঞান কাঁচা থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক বিষয় পড়ানো হয়, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যে সবের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও ঘটে না। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষা আর বিষয়বস্তুর যে এক দুস্তর ফাঁক রয়েছে সে ফাঁক কি করে দূর করা যায় আশা করি তাও আপনাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাঠ্য বইয়ের যে অভাব রয়েছে তা দূর করার দায়িত্বও আপনাদের, শিক্ষক আর শিক্ষাবিদদের। বিদেশী ভাষা বা বিদ্যাকে আমরা কখনো বর্জন করবো না। করলে তা হবে আত্মবিনাশের সামিল। কিন্তু সে সঙ্গে বিদ্যা আর বিদ্যাদান ক্ষেত্রে আমরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারি সে চেষ্টাও আমাদের অনবরত চালিয়ে যেতে হবে। দৈহিক খাদ্যের বেলায় যেমন, তেমনি মানসিক খাদ্যের বেলায়ও আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। স্বাধীনতার এও তো একটা অর্থ ও লক্ষ্য।

পরিশেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তাঁর উপস্থিতি ও মূল্যবান ভাষণের জন্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এ সেমিনারে উপস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত জ্ঞানী ও গুণীদেরও। আপনাদের আলাপ-আলোচনা দেশ ও জাতির জন্য ফলপ্রসূ হোক, এ আমাদের সবারই আন্তরিক কামনা।

www.pathagar.com

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন
সদস্য-সচিব, সাংগঠনিক কমিটি
ও কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় অধ্যাপক আবুল ফজল, শ্রদ্ধেয় ভাইস-চ্যান্সেলার, সম্মানিত ডেলিগেট ও অতিথিবৃন্দ ঃ

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার—৭৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হওয়াতে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছি। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে সেমিনারের উদ্বোধন করেছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর অমূল্য ভাষণ আমাদের শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করবে।

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতি দেশের প্রবীণতম শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল তাঁর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাদের অপরিসীম প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এই জাতীয় শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁরা আর্থিক বরাদ্দ ছাড়াও সর্বাত্মকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরীর নির্দেশনা আমাদের সকল কর্মতৎপরতার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাংগঠনিক কমিটির অপরাপর সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয় সাহায্যদানের ফলে এই সেমিনারের আয়োজন সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য যাঁরা বিভিন্ন আলোচনা অধিবেশন সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছেন এবং যাঁরা স্বল্প সময়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাদের শিক্ষার সংকট উত্তরণের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা নির্দেশ করবেন তাঁদেরকে সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা প্রসাশনের প্রতিনিধিবর্গ এবং সুধীবৃন্দ যাঁরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশের দূর-দূরাঞ্চল থেকে যে সব ডেলিগেট অত্যন্ত কষ্ট করে জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে যোগদান করে একে সাফাল্যমন্ডিত করে তুলেছেন তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, কর্মচারী ও ইউ, ও, টি, সি, অফিসার ও ক্যাডেটগণ সেমিনার সাফল্যমন্ডিত করার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যবস্থাপনায় আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

২
প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা

শিক্ষার মান ঃ

- **মাধ্যমিক শিক্ষার মান**

  ডঃ শামসুল হক, অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট।

- **কলেজ শিক্ষার মান**

  জনাব আমিনুল হক, অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

- **বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান**

  ডঃ মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার পরিবেশ ঃ

- **মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ**

  জনাব শামসুল কবীর, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট।

- **কলেজ শিক্ষার পরিবেশ**

  হোসনে আরা শাহেদ, অধক্ষ্যা, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ ঢাকা।

- **বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ**

  অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার মান

ড: শামসুল হক
অধ্যাপক, শিক্ষাও গবেষণা
ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

মূল আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি সে কথা স্মরণ করা সংগত হবে। সকল যুগে সকল দেশে সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য কোন সাধারণ সংজ্ঞা বা লক্ষ্য নাই। এ কালের শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সকল ক্ষমতাকে বিকশিত ও মার্জিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী সফল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মননশীলতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টি-ভংগির অধিকারী করে তুলতে সাহায্য করা। অর্থাৎ, তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুসারে তার সম্মুখে জীবনের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা সূত্রে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রাসংগিক হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর শিক্ষা পিরা-মিডের ভিত্তি। যতদূর জানা যায় জনশিক্ষা কর্তৃপক্ষের এক হিসাব মতে প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী বয়সের শতকরা ৫৮ জনের মত ছেলে-মেয়ে কোন না কোন সময়ে প্রাথমিক স্কুলে আসে। প্রথম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয় তাদের আনুমানিক এক চতুর্থাংশ পাঠ শেষ করে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ আছে। যথা, প্রাথমিক স্তরেঃ

(ক) জীবন কেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষা সূচীর অভাব।
(খ) উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা।
(গ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাব।
(ঘ) সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্য-পুস্তকের অভাব।

www.pathagar.com

(ঙ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও লাইব্রেরী পুস্তকের অভাব।

শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

(ক) শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

(খ) শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতূহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায় নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন।

(ঘ) পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি।

দেশের প্রায় ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুলের প্রকৃত চেহারার সাথে আমরা সকলেই কমবেশী পরিচিত। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত সমস্যা-সমূহ কেবল বাস্তবই নয় সেগুলির আকার এত ব্যাপক যে, সেসব সমস্যার কোন ত্বরিৎ সমাধান অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে দুরূহ।এমতাবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার আকাংখিত লক্ষ্য যে অর্জিত হচ্ছে না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা যদিও বা সম্ভব হয় তাহলেও সে শিক্ষার গুণগত মান আশানুরূপ হবে বর্তমানের সামাজিক আবহাওয়ার বিচারে সে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার যুক্তি দেখা যায় না। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং সমস্যার পটভূমিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বিচার করতে হবে। কারণ প্রাথমিক স্কুল উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র মাধ্যমিক স্কুলে আসে জ্ঞান অর্জনের আশায়। মাধ্যমিক শিক্ষার মান বহুলাংশে পূর্ববর্তী এই প্রাথমিক শিক্ষার মানের উপর নির্ভরশীল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তর ও উচ্চস্তরের মধ্যবর্তী স্তর। মাধ্যমিক স্তর বলতে আমরা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বোঝাচ্ছি। শিক্ষার 'মান'-এর ধারণা আপেক্ষিক। কারণ মান, তথা শিক্ষার মান, তথা মাধ্যমিক শিক্ষার মান পরিমাপক মানদন্ড চাই। গবেষণা লব্ধ তথ্য বা কোন তাত্ত্বিক মানদন্ড ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার মান বিচারের ব্যবহারিক পরিমাপক অবশ্যই আছে। এই ব্যবহারিক পরিমাপক হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যের পটভূমিতে ছাত্রের অর্জিত সাফল্যের পরিমাণ। অর্জিত সাফল্যের মাত্রা অনুপাতে প্রতিযোগিতামূলক বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সাফল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। জ্ঞান, মননশীলতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভংগীর আকাংখিতমান ও অর্জিত-

www.pathagar.com

মানের ব্যবধান কম্‌লে শিক্ষার মান উঁচুতে ওঠে। আর এই ব্যবধান যত বাড়ে শিক্ষার মান তত নীচে নেমে যায়।

আকাংখিত মান তখনই অর্জিত হয়েছে বলে ধরা হয় যখন শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করার ফলে শিক্ষার্থী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলকাম হয়। এই সাফল্য কর্মের বাজারে তার চাহিদা ও মূল্য দিয়েও যাচাই হয়।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য-গুলি হচ্ছেঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

(খ) সুমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবন-যাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা।

(গ) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্য-নিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা।

(ঘ) মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৪৫ শতাংশ, অর্থাৎ, তিন কোটির উপর। মাধ্যমিক স্তরে পড়ার উপযোগী বয়সের কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা মোটামুটি এক কোটি। এই সংখ্যার ১৭ শতাংশ মাত্র কোন না কোন পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুলে আসে। বর্তমান বৎসরে সব কয়টি শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-র্থীর মোট সংখ্যা এক লক্ষ ৬৮ হাজার। এদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনও যদি সফলকাম হয় তাহলে পাশের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৪ হাজার। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার এক সমীক্ষা অনুযায়ী কোন উন্নয়ন-শীল দেশের মাধ্যমিক স্তরে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলে-মেয়েদের অন্ততঃ ৫০ শতাংশ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন কেবলমাত্র সে দেশের প্রচলিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সচল রাখার উপযোগী দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনের গরজেই। এ প্রসংগে বাংলাদেশের অবস্থার উপর অতিরিক্ত টীকা নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বিচার প্রসংগে এই স্তরের শিক্ষার মানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক ছাত্র

ছাত্র আসে বলেই স্কুল চলে। সারাদেশে প্রায় আট হাজার মাধ্যমিক স্কুলে ১৭ লক্ষের মত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। স্কুলগুলির শতকরা প্রায় ৯৭টিই বেসরকারী স্কুল। জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুপাতে স্কুলগুলি সুষম-ভাবে বিন্যস্ত নয় এবং জরাজীর্ণ প্রাথমিক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক স্কুলে বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের মানের পরীক্ষা না দিয়েই ভর্তি হয় কিন্তু আমরা জানি যে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মান খুব নীচু। মাধ্যমিক স্কুলে কোথাও ব্যবস্থা অনুপাতে ভর্তির জন্য ভীড় বেশী। কোথাও আবার সুযোগের অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রী কম। বহু ক্ষেত্রে এক স্কুল থেকে অনুত্তীর্ণ ছাত্র বিনা বাধায় পূর্ববর্তী স্কুলের অজ্ঞাতে অপর স্কুলে ভর্তি হয়। এই পরবর্তী শ্রেণীর স্কুলগুলি এই জাতীয় ছাত্র ভর্তিকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখে। বড় শহরে, বিশেষতঃ ঢাকা শহরে, কোন কোন স্কুলে ছাত্র ভর্তির ভীড়ের চাপ প্রচন্ড। আবার কোথাও চাপের মাত্রা সহ্যসীমার অনেক নীচে। ফলে সামগ্রিকভাবে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যেমন আকাংখিত অংকের মধ্যে থাকে না তেমনি ৪০ বা ৪৫ মিনিট সময়ে ১০০ বা তারও বেশী ছাত্রের ক্লাশে পড়ানো শিক্ষকের পক্ষে মর্মান্তিক প্রহসনে পরিণত হয়। অপরদিকে কোন কোন স্কুলে গুটি কতেক ছেলে বা মেয়ে নিয়ে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সাধারণ পঠন-পাঠনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন না। এই প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সহজ সাধ্য নয় এবং আকাংখিত মান অর্জন করা এবং বজায় রাখাও সম্ভব নয়। উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মনোযোগ ছাড়া ছাত্রের জ্ঞান সম্প্রসারণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন এবং তাদের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা সৃষ্টি করাও দুঃসাধ্য। ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে হলে সময় চাই, সুযোগ চাই, উপযুক্ত মান-সিকতা চাই।

নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা বিভিন্নমুখী, শিক্ষার বিভিন্নমুখী শাখাগুলি হচ্ছেঃ

(ক) মানবিক শাখা,

(খ) বিজ্ঞান শাখা,

(গ) বাণিজ্য শাখা,

www.pathagar.com

(ঘ) কৃষি শাখা,

(ঙ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা,

(চ) শিল্পকলা শাখা।

মাধ্যমিক স্কুলের সবগুলিতে শিক্ষার সকল শাখা নাই। অধিকাংশ শাখাও নাই। এখন পর্যন্ত বাণিজ্য, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং শিল্পকলা এই চারটি শাখা যারা নির্বাচন করে তাদের মোট সংখ্যা সম্ভবতঃ মাধ্যমিক স্তরের সকল ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ১০ জনের কম। বিজ্ঞান শাখায় ছাত্র-ছাত্রী শতকরা ১৫ জনের মত। বাকী শতকরা প্রায় ৭৫ জন ছেলে-মেয়ে সনাতন মানবিক শাখাই নির্বাচন করে। কারণ একাধিক। প্রবণতা ও সম্ভাব্য সাফল্যের কোন পরিমাপযন্ত্র নাই, উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই, স্কুলের পক্ষে ব্যয়বহুল বিভিন্ন শাখা খোলার সংগতি নাই, পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নাই, কোন্ শাখা নির্বাচন করলে ভবিষ্যতে কি কাজে সাফল্যের সুযোগ আসতে পারে সে বিষয়ে ছাত্রকে অবহিত করার ব্যবস্থা নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে কোন কথাই নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্রোতকে মানবিক শাখায় প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করে বিভিন্নমুখী করার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসংগে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ গরীবী হালে সম্প্রসারণ করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। আজ পর্যন্ত একটিও সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। এটি একটি সুসংবাদ। কারণ প্রস্তাবটি স্কুলের অবস্থানের বিচারে এবং বাংলাদেশের মৌসুমী আবহাওয়া. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অপ্রতুল যানবাহনের বিচারে বাস্তবে কার্যকর নয়। এ অবস্থার পটভূমিতে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে হলেঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে,

(খ) স্বীকৃত মানের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তি করতে হবে,

(গ) ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত বাঞ্ছিত হারের মধ্যে রাখতে হবে,

(ঘ) অধিক সংখ্যক স্কুলে বিভিন্নমুখী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে এবং ছাত্রের প্রবণতা অনুসারে তাকে সম্ভাব্য শাখা নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে,

(ঙ) স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে পেশাগত নীতিজ্ঞান বজায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষক

শিক্ষকই শিক্ষার প্রধান প্রাণশক্তি। শিক্ষকের মানের চেয়ে শিক্ষার মান উঁচু হয়না। সমাজের চোখে শিক্ষক হবেন সকল গুণের আধার। সদা সত্য কথা বলা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর কারণে তিনি তাঁর জীবন মন উৎসর্গ করবেন এমন প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু যে সমাজ এ প্রত্যাশা করে সে সমাজের পক্ষে শিক্ষকের নিম্নতম প্রয়োজন মিটানোর সাধ্য নাই। ছাত্রের দৃষ্টিতে সেই শিক্ষকই ভাল শিক্ষক যিনি তাঁর পড়ানোর বিষয়ের জন্যে সমৃদ্ধ। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, সব শিক্ষকই নিজ নিজ বিষয়ে আশানুরূপ পারদর্শী নন। শিক্ষকের কর্মজীবনে স্কুল কলেজে অর্জিত জ্ঞান বিদ্যাই যথেষ্ট বলে গণ্য নয়। শিক্ষকতার জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। কিন্তু যে শিক্ষকের পূর্ব জ্ঞানের বুনিয়াদ দুর্বল, যিনি সর্বক্ষণ জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থেকে পর্যুদস্ত, যাঁর নাগালের মধ্যে উপযুক্ত পুস্তকাদি নাই, স্কুলের সময়ের বাইরে যাঁকে বাড়ী বাড়ী ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাতে হয়, তাঁর শিক্ষকতা করার উপযোগী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান চর্চা করার অবকাশ ও মানসিকতা নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে পেশাগত শিক্ষণ শিক্ষকের দৃষ্টিভংগী প্রসারিত করে এবং শিক্ষকতার নীতি ও কলাকৌশল অর্জন করতে সাহায্য করে। বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা মোটামুটি এক-পঞ্চমাংশ। সাধারণ শিক্ষা লাভের পর অতিরিক্ত সায় ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে শিক্ষক যে পেশাগত শিক্ষণ গ্রহণ করেন তার ফলে স্বভাবতঃই তাঁর আকাংখা উদ্দীপ্ত হয়। তিনি তাঁর শ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য প্রত্যাশা করেন। স্কুলগুলি এই অতিরিক্ত মূল্য দিতে বহুক্ষেত্রেই অক্ষম এবং সে জন্য বহু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মহীন থাকেন। অনেকে নিজ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান। এঁদের সংখ্যা বোধ হয় মোট শিক্ষক সংখ্যার শতকরা ১০ জনের কম নয়। শিক্ষকের পেশা পরিবর্তনের ফলে শিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয়িত অর্থের অপচয় হয়।

শিক্ষকের পেশাকে বলা হয় একটি সৃজনশীল পেশা। এই সৃজনশীলতা শ্রেণী কক্ষেই সীমাবদ্ধ নয় বটে, তবে যে শিক্ষক নিজ শ্রেণীকক্ষে সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ যতবেশী পান তাঁর কাজের মাধ্যমে তৃপ্তি তত বাড়ে। এই তৃপ্তি কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়। এ কাজে শিক্ষক সংগঠনও অবদান রাখতে পারে। মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় ৮০ হাজারের মত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষকদের কোন পেশাভিত্তিক সংগঠন নাই। যে সংগঠনটি ছিল সেটিও তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে বলা যায়। পেশাভিত্তিক সংগঠনকে কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ দরকষাকষির যন্ত্র হিসাবে দেখলে অথবা কোন দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে গেলে সংগঠনের সার্থকতা ক্ষুণ্ন হবে এবং

www.pathagar.com

শিক্ষকের পেশার মর্যাদা হানি হবে। শিক্ষকের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি নিজ পেশার ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও প্রয়োজনীয়। ভাবের এই আদান প্রদান, বিষয়ের আলোচনা থেকে নূতন চিন্তাধারা, নূতন কর্মপদ্ধতি, নূতন প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে। পেশার মর্যাদা বজায় রাখতে হলে নিষ্ঠা ও প্রেরণা থাকতে হবে। সংগঠন এ বিষয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উন্নতি এ স্তরের শিক্ষকের মান ও মর্যাদা উন্নত করার উপর নির্ভরশীল। এ জন্য ঃ

(ক) যোগ্য লোককে এ পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে।

(খ) চাকুরীর শর্ত ও পরিবেশ উন্নত করতে হবে।

(গ) বেতন, পেসশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমার সুযোগসহ শহর ও গ্রামের এবং সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রাপ্ত সুযোগের সমতা বিধান করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে এবং কার্যরত অবস্থায় একক বা দলগতভাবে পেশাভিত্তিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঙ) শিক্ষককে চাপমুক্ত অবস্থায় নিজ যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁর যোগ্যতা ও সৃজনশীলতার স্বীকৃতি দিতে হবে।

মাধ্যমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাঞ্ছিত উপায়ে সমাজের চাহিদা পূরণ করাই স্কুলের কাজ। বিশেষ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়। পাঠক্রমের লক্ষ্য প্রতিফলিত করে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয় এবং এই পাঠ্যসূচী অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। শিক্ষক নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের সাথে জ্ঞান, বিদ্যা চর্চা করেন।

জ্ঞান, বিদ্যা অর্জনের প্রেরণা না থাকলে যেমন কাউকে তা দান করা যায় না, তেমনি শিক্ষক প্রাত্যহিক কর্মসূচী অনুসরণ করে কেবল তাঁর কর্তব্যের দায় সমাধা করতে চাইলে শিক্ষার লক্ষ্যও অর্জিত হয় না, মানও বজায় থাকে

www.pathagar.com

না। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে এ যাবৎকাল শিক্ষকের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। শিক্ষার লক্ষ্য স্থিতিশীল নয়। যুগের প্রয়োজনে নূতন চাহিদার দাবীতে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। লক্ষ্য পরিবর্তনের সাথে পাঠক্রম সংস্কার এবং পাঠ্যসূচী পুনর্বিন্যাস করা অপরিহার্য। এই পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকও পরিবর্তনীয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। সে কমিটির কাজও আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় এবং দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতের ইশারায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি যোগ্য নেতৃত্বাধীনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশা করছি।

পাঠ্যপুস্তক প্রসংগে প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলি হচ্ছেঃ

(ক) শিক্ষার লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রমের কাঠামোর মধ্যে পাঠ্যসূচীর যথাযথ প্রতিফলন,

(খ) স্থায়ীত্ব,

(গ) আকর্ষণীয়তা,

(ঘ) সহজলভ্যতা,

(ঙ) নাগরিকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ।

পাঠ্য পুস্তকের কথায় স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের কথা আসে। এই বোর্ড পাঠ্য পুস্তককে সকল দিকে থেকে উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয় করে সুষ্ঠুভাবে ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হননি বটে তবে বোর্ড একটা নিম্নমান বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত সুলভে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহ করার চেষ্টা করে এসেছেন। টেকস্ট বুক বোর্ডের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক একচেটিয়াভাবে বাজারে স্থান পেয়েছে, কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। পুস্তকের গুণ ও মান উন্নত করার জন্য প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে সম্ভাব্য কাজ হতে পারেঃ

(ক) নিয়মিতভাবে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা এবং পর্যালোচনার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব জনশিক্ষা দপ্তর

www.pathagar.com

এবং শিক্ষা বোর্ড এই দুই সংস্থার উপর না রেখে একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত করা।

(গ) পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনা প্রতিযোগিতামূলক করা।

(ঘ) একই বিষয়ে একটি মাত্র পুস্তক নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা অপসারণ করা এবং সকল স্কুলে অবিকল একই পাঠক্রম অনুসরণের বাধ্যতা শিথিল করা।

(ঙ) একটি স্থায়ী সংস্থার হাতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করা সহ পাঠ্যপুস্তকের রূপরেখা, মান ও মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া।

মাধ্যমিক শিক্ষার উপকরণ

পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিমূর্তভাবকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করার রীতি একালে স্বীকৃত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের কোন বিকল্প নাই কিন্তু শিক্ষকের কাজ সহজসাধ্য এবং ছাত্রের দিক থেকে শিক্ষাকে সহজবোধ্য করার জন্য শিক্ষার নানা উপকরণ ও সরঞ্জাম সকল দেশেই ব্যবহার করা হয়। উপকরণের সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায়, যার ফলে উপস্থাপিত বিষয়ের ধারণা মনের মুকুরে অর্থপূর্ণ হয়ে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার সাধারণ অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে ভাল পাঠ্যপুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, খড়ি, ঝাড়ন ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য সকল শ্রেণীর সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বহু স্কুলে নাই, অনেক স্কুলে ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্ল্যাকবোর্ডও নাই। এমনি কি দূরদূরান্তের কিছু কিছু স্কুলে শিক্ষকের প্রাত্যাহিক ব্যবহারের জন্য খড়িমাটি কেনার পয়সাও সব সময় তহবিলে থাকে না।

আরো কয়েকটি সাধারণ উপকরণ হচ্ছে মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব ইত্যাদি। যেখানে পাঠ্যপুস্তক এবং ব্ল্যাকবোর্ড নাই সেখানে এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে তেমন আশা দুরাশা। কিছুদিন পূর্বে স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের সৌজন্যে বহু সংখ্যক স্কুল এক প্রস্ত করে মানচিত্র দান হিসাবে পেয়েছে। শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুকাল থেকে 'অডিওভিসুয়েল এডুকেশন সেন্টার' এবং 'ইকুপমেন্ট ব্যুরো' নামক প্রতিষ্ঠান দুটি কাজ করে আসছেন। একথা সম্ভবতঃ সত্যের অপলাপ নয় যে, অনেক স্কুল এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিতও নয়।

বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এমন কি কৃষি

www.pathagar.com

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সবই দেশে তৈরী হয় না। দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে এসব সরঞ্জাম এবং উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নয়। এসব ছাড়াও প্রোজেক্টার, টেপ রেকর্ডার, ডিস্ক রেকর্ড প্রভৃতি উপকরণের ব্যবহার আমাদের দেশে নাই বল্লেই চলে। এ জাতীয় উপকরণ কোথাও থেকে উপহার হিসাবে পেলেও তার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয় কারণ এগুলি ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে, স্কুলে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হবে এবং এগুলির খুচরা যন্ত্রাংশ পেতে হবে।

এ হচ্ছে অবস্থার একদিক। অপর দিকের চেহারা আরো করুণ। স্কুলে পাঠ্যপুস্তক থাকলেও শিক্ষকরা তা নিয়মিত ব্যবহার করেন না। নির্ধারিত পুস্তকের পাঠ অসমাপ্তও থাকে যার ফলে ছাত্রের উপযুক্ত জ্ঞান অর্জনের ধাপে ধাপে অজ্ঞানতার ফাঁক থেকে যায়। অনেকে ব্ল্যাক-বোর্ড, মানচিত্র, গ্লোব ইত্যাদি ব্যবহার করতে কুন্ঠাবোধ করেন। মূল্যবান যন্ত্রপাতি যে স্কুলে যে বিশেষ শাখার শিক্ষার জন্য কেনা হয়েছিল বা দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল সেসব অনেক জায়গাতেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ সেগুলি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নাই অথবা সেগুলি ব্যবহারের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে কাঁচামাল কেনার সামর্থ্য স্কুলের নাই। এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার। সে জন্যঃ

(ক) স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুলভ শিক্ষা উপকরণ উৎপাদন করাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

(খ) সহজলভ্য উপকরণাদি ব্যবহার করার পেশাগত দায়িত্ব শিক্ষকের নেওয়া দরকার।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহার করার কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(ঙ) এক স্কুলে অব্যবহৃত কোন সরঞ্জাম যে স্কুলের সামর্থ্য আছে তেমন কোন স্কুলে ব্যবহারের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে যাতে কয়েকটি স্কুল যৌথভাবে শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত, আদান-প্রদান ও ব্যবহারের বাস্তব ব্যবস্থা নিতে পারে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষা কার্যক্রমের অপরিহার্য অংগ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষ স্তরের জন্য সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর সে লক্ষ্য অনুসারে পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়। পাঠক্রমের কাঠামোর মধ্যে পাঠ্যসূচী নির্ণীত হয় এবং পাঠ্যসূচীর প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তক রচনায়। শিক্ষক তাঁর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কৌশল-জ্ঞানের সাথে শ্রেণীকক্ষে, পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে অবশেষে তার মূল্যায়নও করা হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মূল্যায়নের বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রসংগে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন বলতে আমরা বোঝাতে চাই যে, এ স্তরের শিক্ষা থেকে আকাংখিত জ্ঞান, নৈপুণ্য, দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি শিক্ষার্থী কি পরিমাণে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে সম্বন্ধে তাকে পরীক্ষা করা।

সম্প্রতিকালে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যত আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে। আমরা জানি যে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ভাষাভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষা স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার বহু ত্রুটি আছে। যথাঃ

(ক) পরীক্ষায় নানা প্রকারের অসৎ উপায় অবলম্বন।

(খ) পরীক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা এবং মেজাজ অনুসারে উত্তরের মান বিচারের তারতম্য।

(গ) এ পরীক্ষার জ্ঞান, নৈপুণ্য, প্রবণতা বিচারের অক্ষমতা।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার সাথে পরীক্ষার লক্ষ্যের অসামঞ্জস্যতা।

(ঙ) বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা করার ব্যাপারে নানা ধরনের প্রতিকূলতা।

এসব ছাড়াও পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার নানা কৌশল ও সুযোগ শিক্ষার্থীর জানা আছে। মূল পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত, ত্রুটিপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য সাহায্য পুস্তক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রচনা, বিক্রয় এবং ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে বহুসংখ্যক প্রশ্নের মধ্যে মাত্র স্বল্প সংখ্যক প্রশ্ন বাছাই করা আবশ্যিক এবং বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর শিখে এবং লিখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বাধা নাই। এসবের ফলে নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীর যে জ্ঞান অর্জন করার কথা তা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত

www.pathagar.com

করে এবং সকল পরীক্ষার্থীকে এই মানদন্ডে বিচারও করা হয় না। কখনও আবার পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি আগাম ফাঁস হয়ে যায়। এমন অভিযোগও শোনা যায় যে বহিঃপরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট-মহলে নানা রকম কারচুপি চলে। একথা সত্যের অতিরঞ্জন নয় যে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া একটা বাঁধাধরা ছকে সকল শাখার ছাত্রকে মোট ৬০০, ৪৫০, ৩৩০ নম্বর দিয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করার রীতির মধ্যে ন্যায় বিচারের যৌক্তিকতা কতখানি আছে সে প্রশ্নও পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

স্কুলের হাতে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করার বিষয়টিও তর্কের ঊর্ধ্বে নয়। যে সমাজ দশ বৎসর পর্যন্ত ছাত্রের শিক্ষার দায়িত্ব এবং উন্নতির ভার স্কুলের শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে সেই সমাজই চূড়ান্ত পরীক্ষার ব্যাপারটি কেবলমাত্র স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয়ের ভার শিক্ষকদের হাতে তুলে দিতে নিঃসংশয় হতে পারছেন না। অবশ্য তারও কারণ আছে।

বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই। অবস্থার প্রতিবিধান হিসাবেঃ

(ক) জেলাভিত্তিক শিক্ষা সংস্থা গঠন করে নিজ নিজ জেলার সকল স্তরের ও প্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন নির্ণয়, লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রশাসন পরিচালনা এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব সে সংস্থার হাতে দেওয়া যায়। জেলাভিত্তিক হলে সংখ্যার দিক থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা ও জটিলতা কমবে এবং সেহেতু আশা করা যায় এ ব্যবস্থায় পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনা ক্ষমতা বাড়তে পারে।

(খ) আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(গ) বিবরণমূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় পদ্ধতির পরীক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(ঘ) স্কুল পর্যায়ে প্রতি বৎসর মাত্র একটি বা দুটি পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে কতকগুলি ধারাবাহিক পরীক্ষার মিলিত ফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর অর্জিত সাফল্য বিচার করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

(ঙ) মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক তাদের প্রতিযোগিতা-মূলক মান বিচারের জন্য বিলাতে প্রচলিত 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার মত কোন পরীক্ষা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

ইংরেজ আমলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলের বহু বিতর্কিত প্রতিবেদনটি উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী দিগদর্শন হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। মেকলে চেয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এ দেশে এমন একটি বংশবদ শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিজ্ঞান এবং মেধায় হবে ইংরেজ। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজী মাধ্যমে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সরকারী উদ্যোগের সাথে পাল্লা দিয়ে বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। এতক্ষণ আমরা যে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্কুলের বিষয় আলোচনা করলাম সে ব্যবস্থা সেই ১৮৩৫ সন থেকে প্রচলিত, বিবর্তিত, অবক্ষয়িত ধারার প্রতিভূ। এটিকে বলা হয় সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা। এই সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা ধারার সাথে সমান্তরালভাবে শিক্ষার আর একটি ক্ষীণতর ধারা দেশে প্রবাহিত ছিল, এখনও আছে যার নাম মাদ্রাসা শিক্ষা।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৪৯ সনে মরহুম মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে "ইষ্ট বেংগল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকনষ্ট্রাকশন কমিটি" সুপারিশ করেছিলেন যে, হাই মাদ্রাসার শিক্ষা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে একত্রিত করা হবে এবং ওল্ডস্কীম মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। নিউস্কীম মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য অবশ্য পাঠ্য বিষয়াদি ছাড়াও বিকল্প পাঠ্য হিসাবে ইসলামিক বিষয়াদির ব্যবস্থা থাকবে। ওল্ডস্কীম মাদ্রাসায় ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়াদিও সংযোজন করা হবে। মাদ্রাসাগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা, মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, মাদ্রাসা পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রভৃতি বিষয়ের সুপারিশও এই কমিটির রিপোর্টে ছিল। জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনে গঠিত "ইষ্ট পাকিস্তান এডুকেশনাল রিফর্ম কমিশন" সুপারিশ করেছিলেন যে ওল্ডস্কীম মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরসহ রিফর্মড্ মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সাথে এক করে দেওয়া হবে। জেলাওয়ারীভাবে মাদ্রাসার প্রয়োজন নির্ধারণ করে মাদ্রাসাগুলির পুনর্বিন্যাস করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক প্রভৃতি

www.pathagar.com

স্তরে বিভক্ত করে দেখার পরিবর্তে সাধারণ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে "মাদ্রাসা শিক্ষা" নামক একটি পৃথক শিক্ষা ধারা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের বিবরণ মোতাবেক দেশে বর্তমানে ১৪১২টি মাদ্রাসা আছে। এ সংখ্যার মধ্যে স্বল্প সংখ্যক সরকারী মাদ্রাসাও অন্তর্ভুক্ত। এগুলির বিভিন্ন স্তর এবং পর্যায় আছে। বিভিন্ন স্তরের জন্য পর্যায়ক্রমিক পাঠক্রম আছে। সবগুলি মাদ্রাসায় একত্র প্রায় চার লক্ষ ছাত্র এবং প্রায় চৌদ্দ হাজার শিক্ষক জ্ঞান-বিদ্যা চর্চায় রত আছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার প্রতি মুখ্য গুরুত্ব আরোপ করা। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা সেখানে গৌণ। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে "বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার" স্মারকলিপি থেকে মাদ্রাসা সংস্কারের মূলনীতি নির্ধারণ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপঃ

"জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একত্রিভূত করা এবং পরবর্তী স্তরগুলিকেও সমপরিসর ও যথাসম্ভব সমন্বিত করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা।"

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রসংগে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের মান উন্নয়নের বিষয়টিও বিবেচ্য। মাদ্রাসা আছে। অতএব সে প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা এবং ব্যবহারিক সার্থকতা থাকতে হবে। মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি সবকিছুই পর্যালেচনা করতে হবে।

মৌলিক প্রশ্ন, অর্থাৎ, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন এবং লক্ষ্যের প্রশ্ন সম্পর্কে যদি বিতর্ক না থাকে তাহলে আনুসংগিক অন্যান্য বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। এ প্রসংগেঃ

(ক) মাদ্রাসার স্তর বিভাগ সাধারণ শিক্ষা স্তরের সাথে সমন্বিত করা যায়।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠক্রমের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সে পাঠক্রমের লক্ষ্য সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্যের তুল্য বিবেচনা করা যায়।

(গ) মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য উৎপাদনশীল শ্রম শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায়।

www.pathagar.com

(ঘ) মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকু
করা যায়।

(ঙ) সরকারী অনুদান প্রা
সুযোগ সাধারণ মাধ্যমি
মাদ্রাসার জন্য সমতুল্য কর

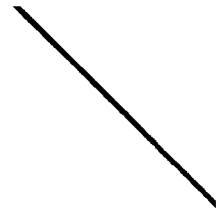

উপসংহার

শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন
সার্থক করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সা
অবস্থার প্রভাব থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা মুক্ত থাকে না। শিক্ষার মান দেশের মানুষের জীবনের মানের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না। একটি অপরটির সম্পূরক। মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নতর ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষার মানের সাথেও সংশ্লিষ্ট। সকল স্তরে উপযুক্ত মান বজায় থাকলেই শিক্ষার্থী স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার পর্যায়ক্রমিক স্তরগুলি অতিক্রম করতে পারে। আমাদের শিক্ষার সমস্যা অনেক। আমাদের বর্তমান শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে নীচু। যাদু-মন্ত্র বলে এ অবস্থার প্রতিকার হবে না। নিজেদের মেধা, সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা অসীম। সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে শিক্ষা প্রক্রিয়া আর এই প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি ও সমাজের বাইরের রূপ এবং অন্তরের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করতে পারে, প্রস্ফুটিত হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রটি ব্যাপক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাপ্তি ও জটিলতাও ব্যাপক। শিক্ষার বহু বিষয় হয়ত চিরকাল বিতর্কমূলকই থেকে যাবে। আলোচ্য প্রসংগে উপস্থাপিত বক্তব্যই হয়ত শেষ কথা নয়। শিক্ষা তথা মাধ্যমিক শিক্ষার সকল সমস্যা বিশ্লেষণ অথবা সে সব সমস্যার সার্বিক সমাধান অন্বেষণ বর্তমান প্রসংগের লক্ষ্য নয়। বর্তমান প্রসংগের মূল্য লক্ষ্য মাধ্যমিক শিক্ষার মান সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য কয়েকটি বিষয়ের ইংগিত দিয়ে সংশ্লিষ্ট সুধী মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

www.pathagar.com

আলোচনা

প্রথম অধিবেশনঃ সময় ৪ঠা এপ্রিল, '৭৬ বিকাল ২টা-৩০মিঃ থেকে ৫টা।

বিষয়ঃ **মাধ্যমিক শিক্ষার মান।**

সভাপতিঃ **ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক,** ভাইস-চ্যান্সেলার, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এই অধিবেশনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের **অধ্যাপক ডঃ শামসুল হক।**

পঠিত নিবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যাপক জনাব আবদুল হালিম, চট্টগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ, হবিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব কে. বি. হায়দার ও চট্টগ্রাম মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব এ. কে. মাহফুজুল হক।

পঠিত নিবন্ধের উপর আলোকপাত করে **জনাব আবদুল হালিম** মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বসম্পূর্ণ, সুসমন্বিত, সামগ্রিক এবং এক ও অভিন্ন শিক্ষাদান ব্যবস্থার বিষয়ে সুপারিশ করেন, যাতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পক্ষে কোন অসুবিধা না হয় এবং কর্মক্ষেত্রে তারা যেন হীন প্রতিপন্ন না হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম এমন ভাবে নির্বাচন ও বিন্যাস করতে হবে যা উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগ প্রবর্তন করা তিনি ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কেননা এ পর্যায়ে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা মংগলজনক হবে। ভাষা ও সাহিত্য, পৃথিবী ও বাংলাদেশের ইতিহাস. গণিত, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সকল ছাত্র-ছাত্রীর অবশ্য পাঠ্য করতে হবে, যাতে তাদের শিক্ষা ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী একটা দৃঢ় ও বিস্তৃততর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করে এ পর্যায়ের জন্য সামগ্রিক ও সংগতিপূর্ণ পাঠক্রম

www.pathagar.com

রচনার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পাঠ্যসূচীতে ৩য় হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য সমাজপাঠ বইটি অর্থহীন। এই বই-এর মাধ্যমে ভূগোল ও ইতিহাস কোনটাই শিক্ষা করা যায় না। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ভাষা রূপে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ যুক্তিসংগত। মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইংরেজী ভাষাকে পাঠক্রমের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন। এই পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে টেক্সট বুক বোর্ডের একচেটিয়া আধিপত্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এইভাবে প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকের গুণাগণ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। পুস্তকের গুণাগণ ও মান উন্নত করার জন্য প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার উপকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রেডিও-টেলিভিশনকে শিক্ষাদানের কাজে আরও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। স্কুল চলাকালীন সময়ে অথবা তার পরেও ছাত্র-শিক্ষকদের উপযোগী পাঠ্য বিষয়ে সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম প্রচার করে রেডিও ও টেলিভিশন শিক্ষাদানের কাজে সহায়তা করতে পারে। পাঠাভ্যাস, জ্ঞানস্পৃহা বর্ধনের জন্য সহায়ক পুস্তক, সৎসাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা সংবলিত একটি রাষ্ট্রীয় প্রকাশনালয় স্থাপনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা পঞ্চাশ জনই মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ার অনুপযুক্ত। শিক্ষাকে সহজ করার নামে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, যেখানে পক্তপক্ষে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর বই পড়তে হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে এবং এরই ফলে সকল পর্যায়ে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত হওয়া উচিত কেননা এর দুর্বলতা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাতে বাধ্য।

জনাব কে. বি. হায়দার বলেন আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যাগত পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে সত্য, কিন্তু গুণগত মান বাড়ে নাই। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের উপর অনেকগুলি বিষয় এক সঙ্গে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে এই সমস্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদিগকে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পড়ানো উচিত। তিনি আরও বলেন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণ প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেন না। তাঁর মতে সংশ্লিষ্ট সকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অবনতির জন্য দায়ী। তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

জনাব এ. কে. মাহফুজুল হক পরীক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তিনি সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য বাহিরের পরীক্ষক নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করনে। সব যায়গায়ই কিছুনা কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু পরীক্ষার পদ্ধতি সেই প্রাচীন আমলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে, তিনি শিক্ষার উন্নতমানের জন্য আধুনিক ও উন্নতমানের পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন।

সভাপতির ভাষণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার **ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক** বলেন, প্রতিটি স্তরে শিক্ষার চরম অবনতি ঘটেছে এবং যুদ্ধোত্তরকালের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের আলোকে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্র, শিক্ষক-অভিভাবক, সমাজ ও সরকারের সমন্বিত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে চলবেনা, সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, সকল শিক্ষার যেটা ভিত্তি সেই প্রাথমিক শিক্ষার মানের উপর। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য প্রয়োজন সুসমন্বিত ও যুগোপযোগী পাঠ্য-সূচীর, প্রয়োজন পাঠোপযোগী পুস্তকের, প্রয়োজন দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকের। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন পড়াশুনা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারী ও প্রশাসনিক উদ্যোগ আয়োজনই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব ও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। 'গণমুখী শিক্ষা' প্রচলনের শ্লোগান পরিবর্তন করে 'শিক্ষামুখী জনগণ' এই শ্লোগান তুলতে হবে। 'গণমুখী শিক্ষা' শ্লোগানই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী, কেননা এই শ্লোগান রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করে, শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাধন করে না তিনি বলেন 'গণমুখী শিক্ষাব' কোন অর্থ হয় না। মানুষকেই শিক্ষামুখী হতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টের সবটুকুই যে গ্রহণ করতে হবে এমন নয়। যতটুকু দরকার বলে বিবেচিত হবে ততটুকুই গ্রহণ করা হবে কিংবা প্রয়োজনবোধে সংযোজন করতে হবে। কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে আমাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষকদিগকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই সঙ্গে শিক্ষকেও আদর্শ শিক্ষক হতে হবে, কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা যত সুন্দরই হোক না কেন, তাকে সফল করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষকেরা আদর্শবাদী ও শিক্ষকসুলভ গুণাবলীর অধিকারী হলে অন্যান্য সকল সমস্যারও সমাধান হবে।

www.pathagar.com

কলেজ শিক্ষার মান

আমিনুল হক
অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ
ময়মনসিংহ।

বিশ্বের এক অন্যতম অনুন্নত অঞ্চল এই বাংলাদেশে ত্বরান্বিত উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বস্বীকৃত এবং যে কোন রকম উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজন জনগণের জাগ্রত চেতনার উন্মেষ, যার সূতিকাগৃহই হচ্ছে সুষ্ঠু বাস্তবধর্মী ও জীবনানুগ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পরীক্ষার অস্বাভাবিক ফলাফল, দু'এক বৎসর আগে-পরে একই "ডিভিশন" নিয়ে পাশ করা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-পরিধির যথেষ্ট তারতম্য, আজ এই ১৯৭৬ সালেও ১৯৭৪-৭৫ এর পরীক্ষা, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের মধ্যে অযৌক্তিক সময় ব্যবধান, পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ভর না হয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নির্ভর পরীক্ষা পাশের হার, কারণে—অকারণে পরীক্ষা পিছনোর দাবী, শিক্ষায়তনের অশান্ত পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, পরীক্ষাকালে 'বিশেষ সুবিধা'র দাবীতে সোচ্চার কণ্ঠ—এই সবকিছুই বলে দেয় যে আজকের বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে।

কলেজ শিক্ষার মান বলতে সাধারণভাবে বুঝি একটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষা জীবনের মধ্যে কলেজে কাটানো ৪/৫ বৎসরে লব্ধ শিক্ষার মান। অর্থাৎ একটি মাধ্যমিক পাশ ছাত্র বা ছাত্রীকে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর পর্ব উত্তরণে আমাদের কলেজগুলো কি মানের শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করছে। উঁচুমানের যে নয় তার প্রমাণই শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য তিনটি উপকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়ঃ ভালো—শিক্ষক, ভালো বই এবং ভালো ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য শিক্ষা-সরঞ্জাম। এমনিতেই আমাদের ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত অনেক কম, তাতে যে কোন ভালো জিনিসের মত ভালো শিক্ষকের সংখ্যাও চাহিদার অনুপাতে অতি সীমিত। কোন শিক্ষক বিরাট পন্ডিত এবং সে কারণেই ছাত্রদের পক্ষে

www.pathagar.com

দুর্বোধ্য, কেউবা তথাকথিত "জনপ্রিয় বা ছাত্রপ্রিয়" হয়ে চাকুরী করে যাচ্ছেন, কেউ আবার এমনও আছেন যাঁরা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গণ-টোকাটুকির ফসল হয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে পরে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছেন, আরো এমন কিছু আছেন যাঁরা জীবিকার্জনের বিকল্প কোন ভদ্র পথ না পেয়ে অবশেষে শিক্ষকতায় ঢুকে পড়েছেন। এদিকে বিভিন্ন কলেজে যেখানে যে ক'জন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আছেন তাঁদের মধ্যেও কিছু বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজে জড়িয়ে থাকার দরুণ অনেক সময় ক্লাস নিতে পারেন না. কেউ আবার যান্ত্রিক নিয়মে এসে ক্লাস নিয়েই চলে যান, ছাত্রদের কোন জিজ্ঞাসা বা সমস্যার প্রতি ফিরে তাকাবার মত অবকাশ নেই তাঁদের, অনেকে আবার ছাত্রদের কোন প্রশ্নের জবাবে কখনো ব্যস্ততার দরুণ, কখনও বা স্বভাবগত কারণে বিশেষ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের এই অহেতুক মেজাজের প্রতিক্রিয়াই কতক ছাত্রকে দুর্বিনীত ও উচ্ছৃংখল করে তোলে, যারা ক্রমে গোটা শিক্ষা পরি-বেশই দূষিত করে ফেলে। এছাড়া আমাদের আজকের শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যেই জনে জনে যত অবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা, পারস্পরিক বিষোদ্গীরণ স্বভাব এবং কখনো রাজনীতি, কখনো কর্তৃপক্ষের নেক নজর কখনো নিছক কিছু স্তাবক ছাত্র সংগ্রহ ব্যাপারে দলাদলি—তার বিষময় পরিণামই হচ্ছে ছাত্রদের মন থেকে শিক্ষকদের প্রতি সকল শ্রদ্ধাবোধের ক্রমবিলুপ্তি।

অবশ্য শিক্ষকের ত্রুটির দায়িত্ব সবটাই শিক্ষকের নয়। অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে কম শিক্ষক নিয়োগ করা হয় অন্যদিকে সরকারী কলেজগুলোতেও বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের যথা-বিহিত পদ্ধতি অনুসরণ অসুবিধার দরুণ প্রয়োজনানুপাতে শিক্ষকের ঘাটতি থেকে যায় যথেষ্ট। একজন শিক্ষককে হয়তো একদিনে পর পর তাও আবার একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন মানের কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়। এই চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে শিক্ষকতার মান ও শিক্ষাদান দক্ষতা হ্রাস পেতে বাধ্য। তাছাড়া বড় বড় ক্লাসে ব্যক্তি পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষকের পরিচয় সম্ভব হয়না, টিউটোরিয়াল, পিরিয়ডিক্যাল ইত্যাদি পরীক্ষা নেবার সুযোগ জোটে না। অথচ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তাদের কাছে দুর্বোধ্য বিষয়গুলিকে সহজবোধ্য করবার জন্য, তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাশের গুরুত্ব গতানুগতিক অধ্যাপনা ভাষণের চেয়ে অনেক বেশী। পরিশেষে আজকের শিক্ষক সমাজ আগের মত আর 'নন-কম্পিটিং গ্রুপ' বা 'আপনাকে নিয়েই আপনি' শ্রেণী বিশেষ নয়। যার ফলে একজন শিক্ষককে এখন সমাজে একই বিত্তশ্রেণীর অন্যান্যদের সম বা কাছাকাছি মান বজায় রেখে পরিবার প্রতিপালন করতে হয়, তাই শিক্ষক ক্রমে ব্যবসায়ীতে পরিণত হন, শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষা বিক্রয়ের দিকেই বেশী নজর রেখে অনেকে পাইকারী ট্যুইশানী শুরু করেন,

www.pathagar.com

স্বনামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যবসায়ে নেমে পড়েন, অনন্যমনা হয়ে শিক্ষা-সাধনার সময়-সুযোগ কোথায় তাঁদের? তাছাড়া উপযুক্ত বই ও অন্যান্য উপকরণের অভাবের দরুণ শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব হয়না। তখন একদল ভাবলেশহীন চোখ মুখের সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের মনে একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকতা জীবনের উপরই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা এসে যায়। ফলে একদিকে সাধারণভাবে শ্রদ্ধাহীন, দুর্বিনীত ও উচ্ছৃংখল ছাত্রদল, অন্যদিকে নিষ্ঠাহীন ও আপন পেশায় শ্রদ্ধাহীন কিছু শিক্ষক এই দু'য়ের মধ্যেকার বিকৃত সম্পর্কের উপর ভিত্তি-শীল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অবনতির দিকেই চলছে।

এসমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষককেই এগিয়ে আসা দরকার। নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিক নীতিতে নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মানবিক, আন্ত-রিক, হার্দ্য, সরল সম্পর্ক গড়ে তুলে শিক্ষককে তাদের আস্থাভাজন হতে হবে। তবেই শিক্ষক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সব অবিশ্বাস, অমূলক ভীতি ও অশ্রদ্ধা কেটে যাবে এবং তাদের শ্রদ্ধাবনত অন্তর তখন শিক্ষাগ্রহণে উন্মুখ ও আগ্রহী হয়ে উঠবে। তারপরে বিভিন্ন বিষয়ে টিউটোরিয়াল, পিরিয়ডি-ক্যাল পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে অথবা ক্লাশে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানলাভের দিকে পথ নির্দেশ দেওয়া সহজ হয়ে যাবে। অবশ্য এ সবের জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশুনা ও পরিশ্রম করা দরকার এবং তার জন্য আবার চাই কিছু উপকরণ, চাই মানসিক নিশ্চিন্ততা।

ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্যই প্রথম প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে বই। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাস পর্যায়ের বই অবশ্য যথেষ্ট পাওয়া যায় তবে ছাপা বাঁধাইয়ে, ভাষায়, বানানে, তত্ত্ব বা তথ্য বিশ্লেষণে সেগুলো যথেষ্ট উচ্চমানের নয়। অন্য পক্ষে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বই বাজারে পাওয়া যায় কম, পেলেও তার দাম সাধারণ অভিভাবকদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এদিকে বেসরকারী কলেজগুলোতে তো বটেই, সরকারী কলেজের গ্রন্থা-গারেও এ জাতীয় বইয়ের বিশেষ অভাব। তাছাড়া গ্রন্থাগারে যে ক'টা বই-ই আছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রান্থাগারিকের অভাবে তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ অথবা বন্টন হয়না। এদিকে স্বল্পসংখ্যক ও বিরল বই সাধারণতঃ ছাত্র-দেরকে ইস্যু করা হয়না, যদিও উপযুক্ত পরিবেশ সমন্বিত একটি পাঠকক্ষের ব্যবস্থাও খুব কম কলেজেই বর্তমান। বিদেশী বই আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ তাদের হাতে অতি প্রয়োজনীয় বইগুলির একটি তালিকা দিয়ে সেই মত বই আনিয়ে দেবার নির্দেশ দিতে পারেন। একই সঙ্গে দেশের মধ্যেও বই-রচনার উৎসাহ দিতে হবে। উচ্চতর শ্রেণীর জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় লেখা বই একান্তই অপ্রতুল। এদিক দিয়ে বাংলা একাডেমী বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু তা একটু ধীরগতি সম্পন্ন। তাই যথা-যথ মহলের সঙ্গে সংযোগ ক'রে নিয়মানুগভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিদেশী বই অনুবাদের অনুমতি সংগ্রহ করে বাংলা একাডেমী ও বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ তার অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বই ছাড়া আনুষংগিক অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের যোগানও বিভিন্ন কলেজে খুব কম। সাধারণতঃ দেখা যায় কিছু কিছু বেসরকারী কলেজে যে কোন অতি সাধারণ পর্যায়ের এবং যে কোন মানের কিছু কাঁচের জিনিষপত্র, কিছু সামান্য অ্যাসিড, কেমিক্যালস জাতীয় উপকরণ, কিছু নিক্তি-স্কেল ইত্যাদি কিনেই বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমোদন লাভ করে। এ অসুবিধা প্রতিরোধের জন্য বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতির নির্দিষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে যেন তালিকা অনুযায়ী উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ খোলার অনুমোদন দেওয়া না হয়। তবে বড় কথা হলো উপকরণের পরি-মাণ নয় বরং তার উপযুক্ত ব্যবহারই আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নের যথার্থ সহায়ক। স্বল্পতা তো আছেই, থাকবেও আরো কিছুদিন, কারণ একদিকে টাকার অভাব, অন্যদিকে সব জিনিষ দেশে মেলে না, বিদেশ থেকে আনাতেও সময় লাগে। কিন্তু দেশী হোক, বিদেশী হোক, যেটুকু উপকরণ সংগৃহীত হয় বা আছে তার যথার্থ সদ্ব্যবহারকে সর্ব প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে আমাদের।

সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টাই আমাদের ছাত্র-শিক্ষক সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষকের দিক থেকে যে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনার দরকার পরিপূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা ছাড়া সেটা সম্ভব হয় না। ভদ্রভাবে সম্ভ্রম নিয়ে সমাজে বাস করতে যে সংগতির প্রয়োজন সেটা শিক্ষককে দিতে হবে। অথচ আমাদের দেশে বিশেষতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতন ভদ্র জীবন সম্মত নয়। শিক্ষকই জাতির অগ্রপথিক তাই শিক্ষককে বিভিন্ন সৃজনশীল পেশার অনুরূপ বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া উচিৎ। সর-কারী-বেসরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে সমযোগ্যতা ও অভি-জ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা সর্বত্রই সমান হওয়া দরকার। এছাড়া শিক্ষাদানের ক্রম-উৎকর্ষতা বিধানে প্রেরণার উৎস হিসাবে ন্যায্য পদোন্নতির আশ্বাসও দিতে হবে যে পদোন্নতির মাপকাঠি সুনির্দিষ্ট ও

www.pathagar.com

সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। সবশেষে শিক্ষকদের মানসিক নিশ্চিন্ততার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে শিক্ষক শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, কারণ শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে হলে শিক্ষকের মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখতেই হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারকেই সর্ব প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। তবে মর্যাদা দেবার জিনিষ ততটা নয় যতটা নেবার জিনিষ। পরাধীন জাতি হিসাবে আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষকের মানকে এতদিন ধরে অবনমিত করে দেয়া হচ্ছিল এবং পরিণামে সকল আত্মসচেতন ও সম্ভাবনাময় তরুণ শিক্ষকতার পেশা এড়িয়ে চলত। ক্রমে অযোগ্য, নিষ্ঠাহীন ও দায়িত্বহীন শিক্ষকদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান ও কার্যকলাপের প্রতিফল হিসাবে আজকের বাংলাদেশে শিক্ষক সমাজের মর্যাদা নিম্নতম স্তরে গিয়ে ঠেকেছে। তাই আপন মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে আপন বৃত্তিতে শ্রদ্ধাবান ও পূর্ণ দায়িত্ববান হতে হবে, পেশায় ও জীবনের সর্বত্র নিয়ম-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা—শিক্ষককে যে কোন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে উপদেশ ও আচরণে সংগতি বজায় রেখে চলতে হবে। এরকম সুনীতিপরায়ণ ও আদর্শবান, শিক্ষা-সাধনায় সাকাংখ ও তদগতচিত্ত এবং সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরিপূর্ণ স্নেহ, সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতায় উন্মুখ শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি আপন মহিমাতেই ভাস্বর ও সমুন্নত হয়ে উঠবে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজের প্রকৃত ধীমান, প্রতিভাবান ও নিবেদিত প্রাণ তরুণেরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকৃষ্ট হবে এবং পরিশেষে এই মহান পেশা হতে ক্রমে সকল প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ, অনুপযুক্ত ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সরে যেতে বাধ্য করা যাবে অথবা তারা নিজেরাই সরে যেতে বাধ্য হবে।

ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগত উন্নতির মান নিরূপণের উদ্দেশ্যে, একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ জ্ঞানলাভ বা সফলতা অর্জন করল তার পরিমাপের ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কলেজ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পাশ, ক্ষেত্র বিশেষে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে। একই কোর্স সমাপনান্তে সমস্ত দেশের বা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পরিমাণ বা মান যাচাইয়ের জন্য নির্দলীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাগুলির প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ইদানীংকালের "গ্রেস" নম্বরের বদান্যতা, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর বিভিন্নতার মিথ্যা অহমিকা ইত্যাদির ফলে এই প্রয়োজনীয়তা কতটা চরিতার্থ হচ্ছে সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাছাড়া এই পরীক্ষাগুলি মূলতঃ লিখিত, রচনামূলক ও গতানুগতিক ধারা বিশিষ্ট বলে অব্যাহত প্রয়াসের পরিবর্তে পরীক্ষার কিছু আগে বেছে বেছে কিছু অংশের পড়া মুখস্থ করেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে এসব পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব কিন্তু

www.pathagar.com

এ ধরনের সাময়িক ও স্বল্পকালীন পাঠ চর্চায় কিছু পরিমাণে পুঁথিগত বিদ্যালাভ হলেও পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে তাদের সম্যক জ্ঞানলাভ কোন মতে হতে পারে না।

সুতরাং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ করতে হলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির কিছু সংস্কারের প্রয়োজন। পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদির সঠিক রীতি পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলতে থাকুক। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সময়সাপেক্ষ। ততদিন পর্যন্ত প্রচলিত পরীক্ষাগুলি যথা সম্ভব ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত করে চালু রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রথাকে আবশ্যকীয় হিসাবে পুনঃ প্রবর্তিত করতে হবে। এর পাশাপাশি চলতে থাকবে নিয়মিত টিউটরিয়াল ক্লাস যেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় প্রসংগে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান জেনে নিতে পারবে শিক্ষকদের কাছ থেকে। ফলে, পাঠ্য বিষয়ের এবং পাঠ্যসূচীর সমস্তটা তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিগম্য হয়ে যাবে, পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে বেছে বেছে পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা দেবার প্রবণতা কমে যাবে। এছাড়া শিক্ষকগণও শিক্ষার্থীদের দোষ-ত্রুটি ও নানা ধরনের প্রবণতা তাদের মানসিক ও চারিত্রিক ক্রমবিকাশের ধারা ও গতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। পরিচিত পরিবেশে আপন আপন শিক্ষকদের সামনে পরীক্ষা দিতে দিতে তাদের মন হতে পরীক্ষা সম্বন্ধে সব অমূলক ভীতি কেটে যাবে এবং ক্রমে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ় হয়ে উঠবে।

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে অতীত অসাফল্যের স্মৃতি আমাদেরকে এর নির্ভরযোগ্যতার প্রতি সন্দিহান করে তুলতে পারে। কিন্তু অনেক ত্রুটি কলংকে ক্লিন্ন শিক্ষা পরিবেশের ক্লেদমুক্তির মানসেই তো আমাদের আজকের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়োজিত এবং এ ব্যাপারে নিকট অতীতের পরিদৃষ্ট বিশেষ ও নির্বিশেষের ত্রুটি ও দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতিই আজ আমাদেরকে উন্নততর পথ সন্ধানের প্রেরণা ও ইশারা দেবে তাই এবার আর অবহেলা নয়, আমাদের শিক্ষকদেরকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠ ও দায়িত্ব সচেতন হয়ে ন্যায়-নীতির নিরীখে আপনাপন ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যদি কোন বিশেষ শিক্ষক অথবা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারহীন মূল্যায়ন প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় তাহলে সে শিক্ষকের অথবা সে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সবিশেষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দিক হতে দ্বিধা বা অহেতুক বিলম্ব না ঘটে। অতীত ইতিহাস থেকেই আমাদের শিক্ষকদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, শিক্ষাঙ্গণকে যে কোন মূল্যে দুর্নীতিমুক্ত ও পবিত্র রাখতেই হবে।

www.pathagar.com

এছাড়া শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যা নির্ভর পাশের প্রবণতাকে কমাতে গেলে প্রচলিত মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে স্নাতক পাশ পর্যায় পর্যন্ত আনা যেতে পারে। বর্তমান পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ত্রুটি দেখা যায়, যথা পরীক্ষার বহু পূর্বে ফরম ও ফিস গ্রহণ পরীক্ষার দীর্ঘ সময়সূচী, ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব, যেখানে-সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন, ছাত্র-শিক্ষক-পরীক্ষক মহলে দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ও উত্তরপত্র পরীক্ষণে যথার্থ দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিয়োজিত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করে তোলা যেতে পারে। এবং সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও সাধারণ পরীক্ষার সমন্বয় সাধন করে আমরা বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্চতর মানে উন্নীত করতে পারি।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই পাশ করা ছেলে-মেয়েরা কে কোন বিভাগে, কোন বিষয় নিয়ে পড়বে তা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে। অভিভাবকের অনেকেই কখনো নিজেদের দিক থেকে শিক্ষা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে, কখনো এ সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্ব সচেতনতার অভাবে, কখনো বা নিজ কর্মক্ষেত্রের অতি ব্যবস্থতার দরুণ এ ব্যাপারে তেমন পথ নির্দেশ দিতে পারেন না। ফলে, দিশেহারা ছাত্র পরিকল্পনাবিহীনভাবে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির আবেদন করে থাকে। এ ব্যাপারে শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান পরিষদের ব্যবস্থা রাখতে পারলে ভাল হয়।

শুধু মাত্র পূর্ববর্তী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি না করে বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে দুটোর সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা উচিত। এ ব্যাপারে সকল রকম দুর্বলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবকে সম্পূর্ণ অবহেলা বা অস্বীকার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গণে পা দিয়েই শিক্ষকদের সততায়, নিরপেক্ষতায়, দৃঢ়চিত্ততায় প্রথম থেকেই তাঁদের প্রতি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাবান হতে পারে।

কলেজের শিক্ষক সংখ্যা, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্র, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি—ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা সীমিত করা উচিত। নতুবা অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে সেকশন খোলা সম্ভব হয় না অথচ আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির অপ্রাচুর্যের

www.pathagar.com

দরুন বড় ক্লাসের শৃঙ্খলা বিধান করাও অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। সরকারী কলেজে আর্থিক নিশ্চয়তার বলে সেখানে এই নীতিমালা মেনে চলা সম্ভব হয় কিন্তু দেশের অনেক বেসরকারী কলেজ মূলতঃ ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল সেজন্য ভর্তি ব্যাপারে তারা কোন সীমা নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে বরং বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে যথাসম্ভব বেশী ভর্তির চেষ্টাই করে থাকে। সরকারের এবং স্থানীয় জনগণের পক্ষ হতে বেসরকারী কলেজগুলোকে আর্থিক সচ্ছলতার নিশ্চয়তা দিতে পারলে এ ধরনের অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে আরো একটি অসুবিধার দরুণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের ও ফল প্রকাশের সময় সাধারণ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ষের শুরু—এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে কোন সমন্বিত কার্যক্রম থাকে না। ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিকে চান্স নিতে থাকে। এতে তাদের অযথা হয়রানি এবং অর্থ ব্যয়ও হয় আবার অনেক সময় তারা নিজের পছন্দ মত কোর্সও নিতে ব্যর্থ হয়।

যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য ও কার্যকারিতা বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের পাঠক্রম নির্ধারণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং সে জন্যই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, দেশের প্রয়োজন ও জনগণের চাহিদা, আশা—আকাংখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরম্পরাগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কারণ উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবেই আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার অতি নীচু অথচ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও ভয়াবহ, আবার একই সঙ্গে দেশের সমস্ত কর্ম ক্ষেত্রই প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির অভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ। অথচ শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশের সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত শ্রম-যোগান নিশ্চিত করা। সেজন্য দেশের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তিতে যথার্থ শ্রম চাহিদার প্রকৃতি অনুধাবন করতঃ আমাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বাংলাদেশ একান্তই গ্রাম ভিত্তিক—সেজন্য গ্রাম বাংলার প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টিই আমাদের পাঠক্রম নির্বাচনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। এছাড়া আমাদের শহরের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন শ্রম যোগানের বিশেষ অভাব। তাই দেশের শিক্ষাঙ্গণের কেরানী তৈরীর কারখানাগুলোতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গ্রামমুখী তথা বাস্তব জীবনভিত্তিক ভাব—আদর্শের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ আমাদের আর্থিক ও বুদ্ধি-মেধাগত দীনতার দরুণ মোট ছাত্র-জনতার এক বড় অংশই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অথচ এই স্তর পর্যন্ত যেটুকু বাস্তব জীবন

www.pathagar.com

নিরপেক্ষ পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে তা তাদের জীবিকা সন্ধানেরও কোন সাহায্য করতে পারে না। সে জন্য যারা সাধারণ শিক্ষা নেবে তাদের পাঠক্রমেও দু'একটি বৃত্তিমূলক বিষয় অবশ্যই থাকা দরকার যাতে তারা শ্রমের মর্যাদা দিতে পারে, অন্তঃসারশূন্য 'বাবু' হয়ে না থেকে নির্দ্বিধায় সৎ ও স্বাধীন ভাবে উপার্জনের পথ খুঁজে পেতে পারে। কায়িক শ্রম, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমষ্টিগত কল্যাণবোধের সংমিশ্রণ—এগুলো সৃষ্টির সহায়ক করে আমাদের পাঠক্রম নির্বাচন করতে হবে। পাঠক্রমের পাশাপাশি আসে পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস সমস্যা। বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই নতুনতর পড়ার দিকে আগ্রহী হয়ে থাকে অথচ কখনো কখনো সিলেবাস পেতে পেতেই বেশ ক'মাস পার হয়ে যায়। কখনো আবার বছরের মাঝামাঝি হঠাৎ করে সিলেবাসের অংশ বিশেষ পরিবর্তন করা হয়। সময় বিশেষে সিলেবাসে এমনও কিছু সংযোজিত হয় যার সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সেই নতুন বিষয়গুলি সহজবোধ্য করে পরিবেশন করার মত সময়ও হাতে পাওয়া যায় না তাই যে কোন শ্রেণীর জন্য সিলেবাস তৈরীর সময়ে কর্তৃপক্ষের সচেতন থাকা দরকার যেন শিক্ষার্থীরা সময়মত সিলেবাস পেতে পারে, যেন বিশেষ ধরনের প্রয়োজন ছাড়া পাঠ বর্ষের মাঝখানে সিলেবাস পরিবর্তিত করা না হয়। যেন সম্পূর্ণ নতুন কোন পাঠ্যবিষয় সংযোজনের আগে দেখে নেওয়া হয় যে সে বিষয়ে কোন বই সাধারণের প্রাপ্তব্য কিনা, যেন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় একদিকে তাদের পাঠবর্ষের সময় সীমার সঙ্গে এবং অন্যদিকে তাদের জ্ঞানবোধের সঙ্গে সংগতি রেখে নির্ধারিত হয়, যেন প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চারের দিকে দৃষ্টি রেখে সিলেবাসের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা কলেজ শিক্ষাকে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অংগীভূত হিসেবে ধরে কলেজের পাঠ্য বিষয়গুলোর জন্য বিচ্ছিন্ন সিলেবাসের পরিবর্তে সমন্বিত সিলেবাস করা দরকার অর্থাৎ প্রতিটি পূর্ববর্তী স্তরের ও পরবর্তী স্তরের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যেন বিরাট কোন ব্যবধান বা গুরুতর কোন বিরোধ না ঘটে। এ প্রসংগে বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্বের জন্য সমন্বিত সিলেবাসের জন্য প্রয়োজন মত বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংযুক্ত প্রচেষ্টার দরকার। এ ছাড়া বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর জন্য সিলেবাসে কখনো টেক্সট কখনো অনুসরণী হিসাবে যে সব বইয়ের উল্লেখ করা হয় বাজারে তার অধিকাংশের প্রাপ্তি সম্ভবনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত ধারণা থাকা দরকার। আবার আমাদের মত গরীব দেশে ঘন ঘন বই পরিবর্তিত হলে বা দুর্মূল্য বইকে পাঠ্য করলে তাতেও শিক্ষার উপর অনুচিত চাপ সৃষ্টি করা হয় ফলে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকেও অনন্যোপায় হয়ে অমনোযোগীদের দলে ভীড়ে যেতে হয়—হারিয়ে যায় তাদের উন্মুখ মনের সকল অনুসন্ধিৎসা ও জিগীষা। সবশেষে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর অনুপূরক

www.pathagar.com

হিসেবে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের উপযুক্ত সমন্বয় ব্যতীত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা সার্থক হতে পারে না। দেহ ও মন নিয়েই জীবন তাই প্রকৃত শিক্ষার জন্য পুঁথিগত শিক্ষা বা জ্ঞানের পাশাপাশি পুঁথি জগতের বাইরের কিছু শিক্ষারও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানই শিক্ষায়তনগুলির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ক্ষীণদেহ, ক্ষীণদৃষ্টি "পড়ুয়া" ছেলে কোনদিনই জাতির দায় ছাড়া সম্পদ হতে পারে না। অন্য পক্ষে বিদ্যাবুদ্ধি বিবর্জিত খেলোয়ার ছেলেও আমরা চাইনা। তাই লেখা পড়ার পাশাপাশি যেমন সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা দরকার তেমনি ঘরে—বাইরে বিভিন্ন খেলা-ধুলার চর্চাও অতি প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে আজকের বিশৃংখল শিক্ষাঙ্গণে শৃংখলা উদ্দীপক তৎপরতা সৃষ্টির জন্য ইউ. ও. টি. সি., বি. সি. সি., স্কাউটিং ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এদিকে আমাদের সবাইকে সব রকম উৎসাহ ও সাহায্য দিতে হবে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান-সংখ্যা ও শিক্ষার্থী-সংখ্যার দিক দিয়ে বেসরকারী কলেজগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু সংখ্যক বেসরকারী কলেজ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। এসব কলেজে শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য উপকরণের বিশেষ রকমের অভাব রয়েছে, বিশেষতঃ স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে ভুঁইফোড় কলেজগুলোতে এ অভাবের সীমা নেই। তবু বাইরের চাপে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এসব অনুপযুক্ত এবং ক্ষেত্রেবিশিষে এক রকম কাগজে-কলমে অস্তিত্বসম্পন্ন কলেজগুলোকেও স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। অথচ শিক্ষার প্রয়োজন যথার্থ প্রয়োজনীয়, নিজস্ব সামর্থ্য ও সম্পদের সাহায্যে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য, যথাযথ কর্তৃপক্ষের আরোপিত শর্তাদির বৃহত্তর অংশ পূরণে সক্ষম কলেজগুলোই প্রকৃতপক্ষে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও সরকারী সাহায্যের যথার্থ দাবীদার। অযোগ্য, নীতিহীন ও প্রকৃত সামর্থ্য ভিত্তিহীন কলেজের জন্য সরকারী অনুদান একই সঙ্গে সীমিত জাতীয় সম্পদের অপচয় এবং প্রকৃত শিক্ষার পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর। প্রয়োজনীয় শর্তাদির যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষেই কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিদানের এবং স্বীকৃতিলাভের পরেও কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় মান বজায় রেখে চলার ক্ষমতার দিকে কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। এজন্য আমাদের দরকার আরো অধিকসংখ্যক সৎসাহসী ও সুদক্ষ পরিদর্শক যার অভাবে দেশের বিপুল সংখ্যক কলেজের কার্যকরী পরিদর্শন সম্ভব হতে পারছে না।

সরকারী কলেজগুলির মধ্যে সরকারীকৃত কলেজগুলি সম্বন্ধে দু'একটি বক্তব্য আছে। এগুলির প্রায় সবগুলি বিভিন্ন জেলা শহরের বহু প্রাচীন,

www.pathagar.com

সমৃদ্ধিশালী ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় এগুলিকে গ্রহণ করা হয়। জাতীয়করণের পর শিক্ষক বই, আসবাবপত্র ইত্যাদির দিক থেকে বেশ কিছু সংযোজন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুপাতে বরং শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অপ্রাচুর্যই রয়ে গেছে বলা চলে। অবশ্য দফায় দফায় নতুন নতুন পদসৃষ্টি ও অর্থ মঞ্জুরী দ্বারা এসব অভাব মেটানোর চেষ্টা চলছে তবে এ প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত হওয়া দরকার যাতে ক্রমে ক্রমে বনেদী সরকারী কলেজের সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা সরকারীকৃত কলেজগুলির জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই কলেজগুলোর অধিকাংশেই কলেজ ও ছাত্রাবাসের ঘর-দালানগুলি বেশ প্রাচীন এবং যথাযথ মেরামতের অভাবে বিশ্রী রকম জরাজীর্ণ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সি এন্ড বি এর উপর অর্পিত হলে পদ্ধতিগতভাবে এগুলিকে ভেঙ্গে চুরে দেবারই কথা অথচ তা একান্তই বাস্তবতা বোধহীন কাজ হবে। কারণ প্রথমতঃ এই দুর্মূল্যের বাজারে নতুন করে ঘর দালান তোলা বিরাট ব্যয় সাপেক্ষ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যাকে সহজে সমর্থন করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এই সুপ্রাচীন স্থাপত্যগুলি আপনাপন গঠন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যপূর্ণ এবং জাতীয় সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ যোগ্য। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনায় এই জীর্ণ প্রতিষ্ঠানগুহ গুলিকে সহজেই 'ডিসমেন্টাল' করে না দিয়ে বরং সাময়িক মেরামত করলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম অর্থ ব্যয়েই এগুলোকে আমরা আরও ২০/২৫ বৎসর ব্যবহার করার সুযোগ পেতে ও নিতে পারি। কিন্তু এ সম্পর্কে যথার্থ মনোযোগ না দিলে এ দেশের বড় বড় প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বেশ কয়েকটি শিক্ষায়তন একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে, তাই সরকারসহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ সদিচ্ছা আন্তরিকতা নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসা দরকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ACADEMIC STANDARD AT THE UNIVERSITY LEVEL

Dr. M. M. Huque
Professor of Chemistry
University of Dacca.

As I understood this seminar on "Academic Standard at the University level" has as its aim an attempt to identify the causes of the rapid deterioration in the standard of achievement of our students and to suggest as far as possible ways and means of raising the standard. The subject has been of grave concern to the teachers and those at the helm of affairs in the country, The future of the nation depends on how to-day's youth are trained and prepared to shoulder the responsibilities that will fall on them in their manhood. In order to be able to look to a better future it is imperative that the greatest attention is paid to the education and training of to-day's youth. It is not enough only to discuss and hold seminars. Without any further delay a taskforce should be entrusted with the job of evolving the best means of checking the deterioration of the standard of education and raising it. The Government should then take decisive steps towards implementing the suggestions in order to ensure a future for the country.

By University Level education in Bangladesh is meant teaching and examination leading to the Bachelor degree with Honours and post-graduate degrees. The teaching is imparted in the Universities proper

www.pathagar.com

and some of the affiliated colleges which have been named as University Colleges. The syllabii for teaching and examination are set by the appropriate Committee of Courses in each subject. The assessment of the academic achievement of a student is primarily based on his performance in the final examination held at the end of the course. This has been the practice until recent times when attempts are being made to introduce a system of continuous assessment. I shall have occasion to deal with it later.

A look at the syllabii for the Bachelor degrees with Honours and Master degrees of the Universities of Bangladesh will impress any one who is conversant with the standard of the University level education. Yet everybody speaks of the very rapid deterioration in the standard at this level. Standard education is a relative term. When using this term a comparison of the present level of achievement of an average student is made with the performance of an average student some years earlier. We also compare the achievement of our students with that of students holding the same degree from a better University elsewhere in the world. Judging from both the criteria of comparison there is no denying of the fact that the standard of achievement of our students is going down year after year. Every one finds, however, a small number of very bright boys and girls whose level of achievement is very good indeed by any criterion of judgement. They are exceptions and should be treated as such. They should excel anywhere. The discussion here is confined to the case of the average student.

The Causes of Deterioration :

It will be difficult to isolate one or two factors responsible for this downward trend. This is linked

www.pathagar.com

with the changing social and political condition of the country, changes in the accepted norms about values of life. The decisions about education taken by the Government from time to time, the policies of the Universities and the Government in regard to admission into Honours and vis-a-vis facilities available in post-graduate classes, the mode of assessment of the students in the various public examinations etc. These are elaborated in the following paragraphs :

During last thirty years or so the land which constitutes Bangladesh has seen quite a number of political upheavals. The students have played a very significant role in bringing about these changes. Time and again they had left the class rooms to join the general political movements. Such diversions had distracted the attention of many a good student. A result of the involvement of the students in political activities is that during the past two or three decades there has not possibly been a single academic year when the classes have been held regularly. Consequently the contact between the teacher and the student has not been to the desired extent.

Since the early nineteen sixties the Government had taken certain measures about education that have not proved to be conducive to the improvement of the standard of education, perhaps inspite of their good intension. The creation of an elite cadre of civil servants with prospects of greater prestige in social life and pecuniary benefits compared to a teacher led to a situation where a large majority of the brilliant graduates were attracted to join that cadre. In many cases this left only the second best graduates to make teaching a career.

The Education Commission in the early sixties introduced new syllabi for the S. S. C. and the H. S. C.

www.pathagar.com

levels. With the exception of English, Bengali and perhaps one or two other subjects the syllabii were so designed that there was very little difference between what the student learnt in the H. S. C. level and S. S. C. level. This duplication of the study material did not throw any challenge to the good students. The liaison between the Boards of Intermediate and Secondary Education and the Universities in respect of framing of syllabii has been poor. There is a big gap between the H. S. C. level and the University level. No attempt had been made to narrow this gap. Instead, after liberation the Goverment introduced condensed courses in the S.S.C. and H. S. C. levels but the courses at the University level remained what it was before the liberation. The Government took the decision about examining the students on condensed syllabii on certain grounds but without weighing the consequences. In the case of science students the matter became more serious as all laboratory work was dispensed with. Students graduated in science subjects without having learnt the discipline of laboratory or field work. The gap between what the student learnt at the H. S. C. level and what he was expected to learn in the undergraduate courses widened. Only for the very bright students has it been possible to bridge the gap in the time available.

Perhaps the most important factor in the rapid deterioration in the standard of education is the decision to reduce the importance of English without taking adequate steps to make sufficient number of books in Bengali available for students in the degree classes. Instead of being pragmatic about so vital a matter we have been emotional. This decision has caused the average student to grope in the darkness because of the language barrier. The examination

www.pathagar.com

of the scripts at the degree level makes it abundantly clear that even if the student knows certain things he is unable to express it properly.

Some time ago a decision was made by the Government to allow admission of students in the Honours and post-graduate classes in the colleges which were named University Colleges. This was done hurriedly without proper assessment of the staff position, library and laboratory facilities. Soon after the students were admitted the Government was oblivious to the requirements of these institutions in respect of the factors mentioned. True that teachers were trained with the object of placing them in such institutions but soon the Government was obliged to promote these trained teachers to administrative positions. In addition the required number of teachers were not appointed in time. The extra amount sanctioned for improving library facilities and procuring laboratory equipments and chemicals were negligible compared to the requirement of the colleges. A comparison of the amount available yearly to the Chemistry Department of Dacca College and that of Dacca University will throw light on the situation. The annual grant in Dacca College offering H. S. C., Degree pass and Honours courses is in the neighbourhood of Tk.6000/- for purchasing equipments and chemicals whereas the University Chemistry Deparment has a grant of more than Tk. 1. 50 lac for the same purpose for the degree subsidiary, Honours and post-graduate students. No wonder that the graduates of such colleges who come for post-graduate studies to the Universities are inadequately trained in laboratory work. As the prices of things are increasing while the grant remained static the situation continued to deteriorate.

www.pathagar.com

The attitude of the people towards the moral values has undergone a rapid change. Whereas in earlier times, adoption of unfairmeans in the examination hall was considered a crime even by the person who indulged in such practices, the post-liberation period witnessed a situation where such practices were considered as a right by a large section of the students. In some cases, even the parents and guardians also encouraged such practices. Students learnt that a good pass could be obtained without studying. This is a major cause of the deterioration in the standard in recent years.

For some time the Government spokesman and educationists have spoken of education explosion. As a large number of students passed the H. S. C. examinations it was considered that such students should be given the right to go for higher education irrespective of their performances in the S. S. C. and H. S. C. examinations. The admission standard in the Universities and Colleges was relaxed and in many Departments in the Universities a large number of students were admitted without prior planning with regard to staff recruitment, classroom accommodation, library and laboratory facilities. This resulted in a tragic situation. A teacher crying himself hoarse in a lecture room with more than two hundred students can hardly make himself audible to the back-benchers, who soon loose interest. With such a large student-teacher ratio the possibility of student teacher contact became small. The influence of the teacher on the students, which plays a significant part in the educative process, gradually decreased. In the case of science subjects admission of a large number of students put a severe strain on the available resources of the Departments. The standard of training that could be

www.pathagar.com

imparted in a crowded laboratory with only one or two teachers leaves much to be desired.

The method of assessment of the achievement of the students at the University level has not changed until the last couple of years. The age-old process of assessment relied to a large extent on the capacity of the students to select the most probable questions, their ability to memorise the answers and reproduce them in the examination scripts. The questions are stereotyped for years on so that a slightly intelligent student may make a good guess about the probable questions. This is particularly true for the degree pass and subsidiary examinations. The standard of attainment of the students, coming for post-gradute studies, remains, therefore, significantly lower than what could be expected if the questions were set so as to measure the depth of the student's knowledge.

As pointed out earlier the question of academic standard at the University level is not an isolated one. Education is a gradual and continuous process. Unless the standard of education in the schools and colleges are maintained at a reasonable level no attempt at raising the academic standard at the University level will be successful. Adequate steps should be taken at all levels of education if the Government wishes to initiate the process of raising the standard.

Remedies leading to improvement

The aim of the Government in the field of education should be to devise the most suitable means to train the manpower in the various fields of science and technology, arts and literature, so that they can coutribute in an effective way to the rapid progress

www.pathagar.com

of the country in their respective spheres of activities. In order to achieve this objective emphasis has to be placed on the quality of education imparted to our students, while catering to the desire of the student population for higher education. The latter aspect should, however, be tagged with the overall long term national planning which, of necessity, must include manpower planning. The emphasis on quality must start at the schools.

About our educational institution the basic fact must be recognised that the number of relatively well equipped institutions in respect of teaching staff and physical facilities are very small in relation to the number of students,

The following basic facts must be recognised about our schools and colleges :

(a) the number of good institutions in respect of physical facilities and qualified teachers is very small in relation to the number of students.

(b) it is not possible to equip all the institutions with the necessary facilities in a short time with the resources available or which might be available in foreseeable future.

(c) the dearth of qualified teachers cannot be made up at any time unless an all out effort is made to recruit teachers and effectively train them.

The rapid expansion of the horizon of knowledge and the progress made in improving the quality of of education in the advanced countries will not wait for us. It is imperative then that while we make efforts to provide all institutions with the necessary facilities and qualified teachers within the framework of the available resources of the country, at the same

www.pathagar.com

time we pick out the best talents of the country, give them all the facilities and train them in special institutions in such a manner as to attain standards comparable to those attained by the talented students in advanced countries. This step should not be mistaken as a step against socialism. The selection procedure will start from the primary level and the national Government would take upon itself the responsibility of bearing the educational expenses of those who are picked up for superior training. In this way students from any income level will have the opportunity to develop their talents without any financial worries.

In the U. S. S. R. a science city has been established where the best talents in the field of science are gathered and given all the facilities to learn and explore. In this way they hope to get the best out of the superior brains in the country.

To attain good standards in the Universities, the first pre-requisite is to accept that higher education should be made available only to those who have reasonable chances of benefitting from such studies. For this, the admission in the Honours and post-graduate classes sould be restricted to only those who deserve. Such restrictions will lead to a proper student-teacher ratio and increased contact between the teacher and the student.

The role of the teacher in the education process has been grossly minimised, thanks to the present system of public examination. He is not made to feel responsible for the attainment of his students, as the judgement of the attainment of his students is made by another person who may not even have the qualification to make the assessment. The mode of assessment in the public examinations has quite a few serious defects. To remedy these defects and to improve

www.pathagar.com

the standard of education in a steady pace a bold step and a drastic revision in our system of assessment is needed. The role of the teacher as the key figure in education should be recognised. In Dacca University the course system has been introduced in some Departments and it is expected that the other Deparments will soon follow. In this system the responsibility of assessing the achievement and progress of the student is solely on the teachers who give the courses. The assessment is continuous, i.e. throughout the duration of the courses rather than based on a single examination hold at the end of the course.

This mode of assessment may be extended to the colleges and schools. When the role of the teacher as the key figure in the educational process is accepted, the present large scale public examination can be done away with. In fact it is suggested that at the end of the tenth year of schooling each school should be allowed to give its own school leaving certificates to its students. Similarly colleges should be empowered to award their own college leaving certificates or degrees, as the case may be. This procedure would make the teacher fully responsible for the proper education of his students and their assessment. Since the teacher knows about his responsibility he is expected to give his best to the students.

The proposed system would have another salutory effect. Within the frame work of the syllabi laid down for the students of different age groups there will be scope for a particular enterprising teacher to give his students more than what can be given under the present water-tight syllabii designed for the average of a large number of students. If all or most of the

www.pathagar.com

teachers of a given school are enterprising then there will be a significant improvement in the standard of education in that school. Thus by competition the standard of education as a whole might be raised. The freedom for the institution will eventually lead to a situation where one can make a distinction between good schools and bad schools. The better students normally would like to go to better institutions. Here then lies the possibility of selection of outstanding students.

The public examinations at the S. S. C., H. S. C. and degrees pass levels may be replaced by scholarship examinations to pick out the really meritorious. As the number of students in such examinations will only be a small fraction of the present number appearing at these examinations a better judgement about the relative merit of the students will be possible. Besides the time wasted in the present system for the "preparation of the students for the examination" and the delay in the publication of results may be utilised for additional class work.

In order to ensure that the good students can do even better the state should take in hand the improvement of the existing facilities in the better schools while at the same time gradually provide improved facilities to all the schools. This step is suggested because even if it is possible to equip all the schools and colleges within a short time it would take quite some time to produce and train the requisite number of qualified teachers to man these institutions.

Something must be said about the syllabus and the text books. At the present, the syllabus is rather rigid and in the schools the text books are fixed. Under these conditions the talents of the more inquisitive

www.pathagar.com

among the students cannot find ample opportunity to develop their faculties. It is suggested that the institutions be given freedom about the material to be taught and the standard of attainment that the teachers demand of their students. For this purpose the teachers should be given a free hand in writing text books within the broad framework of the syllabus. The function of the Text Book Board will be to keep a watch on the quality of material included in the text book and the get up of the books. For the same age-group there may be books of different standards, with a minimum prescribed by the Board.

It is felt that under the condition suggested, the institutions of higher learning can also raise their standards by gradually demanding more and more of their students. With proper admission tests for entry into such institution only the better students may be selected. Since the standard to be set by any one institution does not have to be tagged with those attainable in affiliated institutions the way for attaining higher standards is always kept open.

It is important to note in this context that top priority be given to education. The social and financial benefits made available to teachers must be made such that the best brains are attracted to the teaching profession. Only then can we expect improvement in the standard of teaching.

Criticism of the proposed procedure

The system as proposed is not an ideal one. It may have its pitfalls. For example, one may argue that if the institutions are empowered to award the school leaving certificate equivalent to S. S. C. and H. S. C. then every student will be allowed to have a

www.pathagar.com

good grade. Such an argument only cast aspersions on the integrity of the teacher. If one cannot rely on the teachers to make an assessment of the achievement of their own students then how can one rely on their teaching. It is possible that there may be unscrupulous teachers. In the long run, however, such teachers will be weeded out.

For some time at the beginning of the introduction of this procedure there remains the possibility of some confusion but soon the students and employers will come to know of the standard of the better institutions. As the merit reflected in the certificate or degree is not stamped by a Board or a University the standard set by the institution will be judged by its students.

The effort and paper—work involved in conducting the examinations may be gainfully employed to keep watch on the performance of the schools and colleges. In this way the growth of Mushroom Institutions which are responsible for the deterioration of the standard of education may be checked.

An argument against the proposed procedure may be that it will not allow the assessment of all the students at a given level on a uniform basis. If one pauses to think, one will find that even with the paraphernalia of Head examiners, scrutineers etc. in the present day public examinations there exist serious lapses, mainly because of the huge number of scripts involved, and maintenance of uniform standard of judgement is not, in effect, possible.

Conclusion :

The new state of Bangladesh has to be in a hurry to develop its potential resources and provide adequate

www.pathagar.com

services to millions of its inhabitants. For this purpose the country must produce good doctors, engineers, scientists, technicians and outstanding people in all fields. In general, people, irrespective of their origin, can become proficient only if proper atmosphere is provided for the spontaneous development of their talents, and when they are unfettered by financial worries. Such an atmosphere can perhaps be created in a relatively short time with the iutroduction of the system proposed. It may be mentioed that it is not a new system. Such procedures have produced very good results elsewhere in the world.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ সময়ঃ ৪ঠা এপ্রিল, '৭৬, বিকাল ৪-৩০মিঃ থেকে ৬-৩০মিঃ।

বিষয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার মান।

সভাপতিঃ **অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান,** ভাইস-চ্যান্সেলার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এই অধিবেশনে দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ এম, মাহবুবুল হক** এবং কলেজ শিক্ষার মান বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ করেন ময়মনসিংহ সরকারী আনন্দমোহন কলেজের **অধ্যক্ষ জনাব আমিনুল হক।**

প্রবন্ধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব খুরশীদ আলম চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব হাসান আজিজুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এম. এ. রকিব, নেত্রকোনা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব তোসাদ্দক আহমেদ ও করটিয়া সা'দত কলেজের অধ্যাপক জনাব খলিলুর রহমান।

পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে **জনাব খুরশীদ আলম চৌধুরী** বলেন, বাস্তবিক পক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। কলেজগুলোতে আজ স্নাতকোত্তর ও অনার্স কোর্স পড়ানো হচ্ছে। অথচ এ দু'য়ের মঞ্জুরীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এর ফলে এবং আরো নানান অসুবিধার জন্য কলেজসমূহের শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচু। তিনি দাবী করেন, অনেক সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠিত কলেজে রয়েছে, যেখানে শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম উন্নত নয়। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতি সনাতনই রয়ে গেছে, তাতে কোন সংস্কার বা পরিবর্তন সাধিত হয়নি। নিয়মিত টিউটরিয়াল পরীক্ষার ব্যবস্থা ও মৌখিক

www.pathagar.com

পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা উচিত। ভর্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক ও উপর তলার চাপও বন্ধ করতে হবে এবং ভর্তি পুরোপুরি ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে করতে হবে। জটিল ও সমন্বয়হীন পাঠক্রম বর্জন করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। বাস্তবমুখী ও পেশা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। বেসরকারী কলেজসহ সকল কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দান নিশ্চিত করতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **জনাব হাসান আজিজুল** হক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ ফেল দেখে শিক্ষার মান আন্দাজ করা যায় না। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পড়ছে। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে ছাত্ররা লেখাপড়া করতে পারছে না। এখানে প্রশ্ন হলো, কেন ছাত্ররা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যহীনতা, শিক্ষা পরিবেশের বিশৃংখলা এবং সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি, সর্বপ্রকার সামাজিক অসুস্থতার দরুনই শিক্ষার মান বর্তমানে অত্যন্ত হতাশাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সর্বত্র পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা হাজারো বার বলা সত্ত্বেও এদেশে এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে পাশ করা ছাত্ররা সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় অনুন্নত দেশে একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের প্রয়োজনে ও দেশ গঠনের প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বিধৃত থাকলেও আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এসবের কোনও প্রতিফলন নেই। দেশের সার্বিক কর্মপ্রবাহে দেশের মানুষকে ফলপ্রসূভাবে সংস্থাপন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যের উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হতে হবে, তবেই প্রার্থিত ফল লাভ হবে।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান বিষয়ক প্রবন্ধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ডঃ এম. এ. রকিব** বলেন, জ্ঞানের দ্বারা মানুষের উন্নতি সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য— এছাড়া শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশকে জানা। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষার উপকরণ ও পরিবেশের উপর শিক্ষার মান নির্ভরশীল। ছাত্ররা কলেজে আসে কিন্তু কি পড়তে হবে তা তারা জানে না। জীবিকার সাথে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা গণমুখী হতে পারে না, আমাদের ডাক্তার, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, শিক্ষক কতটা দরকার সেটা বিবেচনা করেই শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। অনেক

www.pathagar.com

শিক্ষকের জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়, তাই সে সকল শিক্ষকেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকতার মানসিকতা আছে কিনা তা নিযুক্তির সময়েই যাচাই করে নিতে হবে। লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরীর সুযোগ-সুবিধা সকল ছাত্রের জন্য সম্প্রসারণ করে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র রাজনীতিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হতে দূরে রাখতে হবে। সীমিত সংখ্যক মেধাবী ছাত্রকেই শুধু উচ্চ শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। অপরিকল্পিত ভাবে যত্রতন্ত্র কলেজ স্থাপিত হয়েছে, এগুলি অনুমোদনের জন্য আরোপিত ন্যূনতম শর্ত পূরণ করেনা। এই সব কলেজগুলোকে একত্রীকরণ করে এদের সংখ্যা কমাতে হবে। কলেজগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

আলোচনা প্রসঙ্গে নেত্রকোনা কলেজের অধ্যক্ষ **জনাব তোসাদ্দক আহমেদ** বলেন, শিক্ষার মান নয়—কিভাবে শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাই আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। বিভিন্ন পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বেসরকারী কলেজগুলোর আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ কলেজই আজ চরম আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন উচ্চ শিক্ষাকে সীমিত করার সুপারিশ করেছিল। আমাদের কৃষি প্রধান দেশে শিক্ষাও কৃষি-ভিত্তিক হওয়া উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির কথা সর্বত্র বলা হয়, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। খাদ্যের পরই শিক্ষার স্থান, তাই শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যে ভাবেই হোক সংগ্রহ করতে হবে। স্কুল, কলেজগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই উদ্দেশ্যে গঠিত পৃথক সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। চাপের মুখে অনেক সময় কলেজগুলোতে অযোগ্য, অশিক্ষকসুলভ লোকও নিযুক্তি পেয়ে যায়। এ রূপ যাতে না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজগুলির পরিচালনার জন্য যে গভর্নিং বডি গঠন করা হয় সেগুলির সাংগঠনিক কাঠামো কেমন হবে সে সম্পর্কেও যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে নয়, স্বীয় সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির স্বার্থে অনেকেই গভর্নিং বডির সদস্য হতে আসেন। এ রূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিং বডির কাছ থেকে আমরা কি আশা করবো? এই কারণে গভর্নিং বডির সাংগঠনিক কাঠামো এ রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে উহা কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং শিক্ষা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। বর্তমানে বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকগণ মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন না, এই অবস্থায় আপনারা তাঁদের কাছ থেকে কি শিক্ষাদান আশা করেন? শিক্ষার মান নয় স্বয়ং শিক্ষাই আজ বিপর্যয়ের মুখে। এই বিপর্যয় রোধ করতে হলে, কলেজ শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে, শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক অবস্থার দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি

www.pathagar.com

দিতে হবে, প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

করটিয়া সা'দত কলেজের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি **জনাব খলিলুর রহমান** বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে পেঁাছেছে। এই মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে হবে। পত্র-পত্রিকায় এই অবস্থার চিত্র সম্যকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বেসরকারী কলেজগুলোর অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। শিক্ষা ধ্বংস হলে জাতিও ধ্বংস হবে। যত্রতত্র বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনে নয়, কেবল ফিতা কাটার প্রয়োজনে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র না থাকলে একটি বেসরকারী কলেজ টিকে থাকতে পারে না, নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকলে দান খয়রাত দিয়ে একটি কলেজকে টিকিয়ে রাখা যায় না। ১৯৭১ সালের নয় মাসের ছাত্র বেতন যখন মাফ করে দেয়া হয়েছিল তখন কলেজগুলোকে কোন অর্থ সাহায্য দেয়া হয়নি। অথচ ঐ সময়ের জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন কলেজকে দিতে হয়েছে, সরকারী নির্দেশে ছাত্র বেতন মওকুফ করে দিয়ে যে আর্থিক বোঝা কলেজগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া হলো সে বোঝা এখনো কলেজগুলি বয়ে বেড়াচ্ছে। ছাত্র বেতন বাড়ানো সম্ভব নয় অথচ সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতনের স্কেল বাড়াতে হচ্ছে। পাশের হার কম হওয়ার দরুন কলেজের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তদুপরি অপ-রিকল্পিতভাবে যত্রতত্র বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ছাত্র সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই সকল কারণে অধিকাংশ কলেজের আর্থিক সংগতি উহার টিকে থাকার জন্য নেহায়েত অপর্যাপ্ত। বেসরকারী কলেজগুলো আর্থিক অনটনের দরুন আজ ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারী অনুদান যা দেয়া হয় সেটা কলেজসমূহের মধ্যে বন্টনের জন্য কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই। এই অব্যবস্থা বেসরকারী কলেজগুলোর ধ্বংসকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ধ্বংসোন্মুখ কলেজ শিক্ষার বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে হলে, কলেজ শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অবিলম্বে যথাযথ কর্তৃ-পক্ষ কর্তৃক সুবিবেচিত ও সুনির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রীকরণ বা বিলোপনের মাধ্যমে বেসরকারী কলেজের সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে এনে এই সব কলেজের বাজেটে যে ঘাটতি দাঁড়াবে তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের কর্মসূচী সরকারকে হাতে নিতে হবে।

সভাপতির ভাষণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার **অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান** বলেন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মী তৈরীর জন্য জনসংখ্যা জরীপের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিভিন্ন বক্তার আলোচনার সার-সংক্ষেপ করে বলেন, আজকের আলোচনায় সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, জাতীয় জীবনে যার যার স্থানকে আবিষ্কার করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনশক্তি জরীপ করা হয়, অর্থাৎ কোথায় কোন কাজে কি রূপ যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন কত লোক প্রয়োজন সে সম্পর্কে জাতীয় ভিত্তিতে জরীপ করা হয়। অপর একটি কথা উঠেছে যে, কিছু কিছু কলেজে অনার্স ও এম. এ. পড়ানো উচিত কিনা। বিভিন্ন দেশে এই রীতি আছে, বৃটিশ আমলেও এদেশে কিছু সংখ্যক ইউনিভার্সিটি কলেজ ছিল। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, এতে এক সময় প্রতিবাদ উঠেছিল কলেজগুলোর দিক থেকেই। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের যৌথ দায়িত্বের ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা নানা প্রকার মত প্রকাশ করেছেন, বর্তমানে সব দেশেই পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতিতে ছাত্রের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তাই সমাজতন্ত্রী, ধনতন্ত্রী নির্বিশেষে সকল দেশেই পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করা হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় হওয়া দরকার। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা না হলে শিক্ষার মানের উন্নতি অসম্ভব।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ

শামসুল কবীর
বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও
গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

শিক্ষার স্বরূপঃ

শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার শুরুতেই আমরা নিসংশয়ে একটি সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারি এবং তা হচ্ছেঃ শিক্ষা নিরন্তর তার পথ কেটে চলেছে। এ পথ চলায় তার ওপর দেশকালের প্রভাব পড়ছে এবং এ প্রভাব গভীরতর। বস্তুতঃ কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই একদিকে যেমন বিশিষ্ট সমাজ পরিমন্ডলের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারে না, অন্যদিকে তেমনি তা সে বিশিষ্ট পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে একটি বিচ্ছিন্ন জগত নির্মাণ করতে পারে না। অবশ্য, আমরা একটি বিশিষ্ট সমাজ পরিমন্ডলে বাস করে, বিশিষ্ট সামাজিক আবহাওয়ায় লালিত হয়েও শিক্ষার জগত ঘিরে একটি স্বপ্ন পরিমন্ডল রচনা করি। কারণ, বাস্তবে যা—কিছু প্রীতিকর নয়, যা—কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় বাঞ্ছিত রূপ পরিগ্রহ করেনি তাকে আমরা বর্জন করতে সদা উন্মুখ ও তৎপর হয়ে উঠি। শিক্ষাকে কেন্দ্রে রেখে জীবন সম্পর্কে আমাদের কামনা উদ্দীপিত-অসুন্দরের অবসান হোক, সুন্দরের যাত্রা হোক চিরায়ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই, শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিতন্ডার অন্ত নেই, বিতর্কও সীমাহীন—কখনো তা যুক্তি নির্ভর, আর কখনোবা তা আত্যান্তিক উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন। বৈঠকী হাল্কা আড্ডা থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিক আলোচনায়ও শিক্ষা সহজেই আমাদের চিন্তাকে অধিকার করে। আটপৌরে গৃহযাত্রায় অভ্যস্ত গৃহিণী যেমন নিজের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত চিন্তা করতে গিয়ে শিক্ষার কথা বলেন তেমনি ঝানু শিক্ষাবিদও শিক্ষা প্রসংগে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। কারণ, সমাজের গতিশীলতার অন্যতম বাহন হিসেবে শিক্ষা নতুন মতের ও নতুন পথের সন্ধানে ফেরে এবং এ'মত ও পথ যখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যমুখী হয় তখনই শিক্ষা একটি দেশকালের আওতায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজ ব্যবস্থার ক্রম-উত্তরণে বিদ্যালয়ঃ

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ তার বিশিষ্ট প্রয়োজনে

www.pathagar.com

বিদ্যালয় গড়েছে। সমাজ ব্যবস্থার ক্রম-উত্তরণের পথে বিদ্যালয় তার অবশ্য অংগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ মানুষ যখন পারস্পরিক দায়িত্ব বন্টনে উদ্যোগী হয়েছে তখন শিক্ষাদানের বিশিষ্ট দায়িত্বটি বর্তিয়েছে বিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানের ওপর। শিক্ষা তাই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার, উপাসনালয় ইত্যাদিও শিক্ষার কাজ করে থাকে। কিন্তু তাই বলে এদের কারোরই মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়। কাজেই সামাজিক দায়িত্ব ভাগে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অথচ সুকঠিন ভূমিকা পেয়েছে। এ ভূমিকা একাধারে শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের, এ কাজ মানুষ গড়ার কাজ এবং এমন মানুষ যারা উৎপাদনক্ষম এবং এ উৎপাদন সামাজিক উপযোগিতায় অর্থবহ ও তাৎপর্যময়। অন্য অর্থে, সমাজ তার অগ্রগতি ও উন্নতির নিশ্চয়তা চেয়েছে বিদ্যালয়ের কাছে। এ নিশ্চয়তা বিধান তখনই সম্ভব হবে যখন বিদ্যালয় যে 'মানুষ' গড়বে তারা সমাজ—গড়ার কাজে সার্থকভাবে নিজেদের দক্ষ শ্রম ও কুশলতা বিনিয়োগ করতে পারবে।

সমাজ ও শিক্ষা মূলতঃ অভিন্ন সত্তা। কবি শ্রেষ্ঠ ওয়াল্ট হুইটম্যান একদা বলেছিলেন,

> "There was a child went forth everyday, and the first object he looked upon that object he became" ১

হুইটম্যান শিশুর যে পরিণতির কথা বলেছেন তা তার সামাজিক পরিণতি। এ পরিণতি লাভে তার মুখ্য নির্ভরতা মানুষের ওপরেই—কারণ সেও মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে উঠবে।

শিক্ষা তাই একান্তভাবেই সামাজিক এবং বিশিষ্ট মানবিক প্রক্রিয়াই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের নিয়ামক। কাজেই, এ প্রক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষার উপকরণ, সাজসরঞ্জাম, ভবন, ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এ দু'য়ের মধ্যকার সুষ্ঠু ও সার্থক বিনিময়ের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত।

উল্লিখিত আলোচনার নিরিখে আমরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কিত কতগুলি মৌলিক বিষয় স্বীকার করে নেবঃ

---

1 Walt Whitman, The objects children look upon. The Social Foundations of Education : C. S. Brembeck John Wiley & Sons, New York 1966 গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ৩।

www.pathagar.com

(এক) বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সমাজ সংগঠনের মধ্যেই শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের লক্ষ্য অর্জিত।

(দুই) মানবিক সম্পর্ক ঘটিত (human relations) মনস্তত্ত্বের ওপরই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনাচরণের ভিত্তি নিহিত।

(তিন) প্রত্যেকটি শ্রেণীকক্ষই একটি ক্ষুদে সমাজ এবং এই ক্ষুদে সমাজের সমবায়ে গঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়।

(চার) বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্যঃ

শিক্ষা জগতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা একটি বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ। আমাদের শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের এ শিক্ষার আওতায় আমাদের বিরাট জনশক্তি রয়েছে প্রস্তুতির পর্বে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর যে বিবৃতি দিয়েছেন তা হচ্ছেঃ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, সুসমন্বিত ও কল্যাণ-ধর্মী জীবন যাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা, দেশের অর্থনৈতিক অগ্র-গতির প্রয়াসে কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী-দেরকে তাদের প্রবণতা ও মেধা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা। এ বিবৃতির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্পসংখ্যক মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হবে। ২

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীঃ

মাধ্যমিক স্তরের তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার আয়োজনে সবার আগে বিকাশমান জীবনের মনস্তত্ত্বই আমাদের বিবেচনা লাভ করবে। বয়ঃ-সীমায় এ তরুণ শিক্ষার্থীগণ কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের। এ সময়ে শিক্ষার্থীর মনের জগতে সূচিত হয় বিরাট রকমের পরিবর্তন এবং এ পরি-বর্তন বাইরের জগতের সঙ্গে বিচিত্রতর সংঘাতের সৃষ্টি করে। বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসা দীর্ঘ লালিত প্রথা ও সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে পরখ করে দেখতে চায়। ফলে, তারুণ্য সমাজের স্থির প্রবাহে আবর্ত সৃষ্টি করে এবং তাতে আনে গতি ও ক্ষিপ্রতা। এজন্য তারা সহজেই সময়—বিলা-সীদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদী শক্তিরূপে চিহ্নিত হয়।

২। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ৭৪, অনুচ্ছেদ ৮·২

www.pathagar.com

বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ পরিবেশঃ

আমরা আগেই বলেছি, বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজেরই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। কাজেই, এখানে পরিবার ও সমাজ জীবনের ছায়াপাত অনিবার্য। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন, ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক পরিমন্ডল থেকে। তবে সাধারণভাবে এরা মধ্য-বিত্তেরই প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যবিত্ত চরিত্রে আদর্শের প্রতি মোহের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে উচ্চাকাঙ্খা। ফলে, এরা সহজেই দোদুল্যমানতার শিকার এবং প্রতিবাদে উচ্চ কন্ঠ।

আমরা আমাদের সমকালীন অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তরুণ সমাজ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা তাদেরে 'আমাদের বিবেকের কন্ঠস্বর' বলেছি। আমাদের ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদেরই দেখেছি পুরোভাগে। তারুণ্যের শক্তি সেখানে সৃষ্টিধর্মী। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে আমরা তারুণ্যকে দেখেছি ভিন্ন শক্তিরূপে। কিন্তু কেন?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জীবনাচরণে বৃহত্তর জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটে। কাজেই শিক্ষার্থীদের ওপর দোষের মোটা ভাগটি চাপিয়ে মানসিক তৃপ্তি লাভের অবকাশ নেই আমাদের। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বৃহত্তর জনজীবনেও আজ বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তির পরিস্থিতি বিরাজমান। কাজেই, শিক্ষার জগত তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে প্রকোষ্ঠবন্দী হয়ে থাকতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের তরুণ সমাজে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এনেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদর্শহীনতা, শক্তি ও বীর্যের উদ্দেশ্যমুখী প্রয়োগের ক্ষেত্রের অভাব, সম্পদলাভে ব্যর্থতা, এক কালের উদ্দীপ্ত শক্তিকে ভিন্ন পথে প্রলুব্ধ করেছে। এদের মধ্যে মধ্যপন্থীরা ভুগেছে দারুণ হতাশায়। তারা বলছেঃ আমাদের অতীত নেই, বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যত অনিশ্চিত। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সমাজ এদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতা শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান চর্চা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনা। অন্যদিকে, স্বাধীনতা উত্তরকালে অপ্রত্যাশিত কিছু সুযোগ আমাদের প্রলুব্ধ করেছে ভাগ্যের খেলায়—পরিশ্রমী মানুষের সাধনার মন তার পরিচর্যার ক্ষেত্র পায়নি। পারিবারিক যোগাযোগ, প্রভাব বিস্তারের অদৃশ্য প্রচেষ্টা তরুণদের মধ্যে এক অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। 'ফন্দি—ফিকির করে কোথাও ঢুকে পড়'—আজকের দিনে এ হচ্ছে পরিচিত শ্লোগান। ফন্দি—ফিকিরের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন সত্যিকার শক্তি বা যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের তরুণদের মনে এ বিশ্বাস

www.pathagar.com

দানা বেঁধে উঠেছে যে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা না করেও ফন্দি—ফিকির ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তিলাভে এ বিভ্রান্তিকর পরিবেশ আমাদের তরুণদের আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে তুলতে পারছে না। ফলে তাদের মনে যে হীনম্মন্যতার বীজ ঢুকছে তা অবাঞ্ছিত গলিপথে আত্মপ্রকাশ খুঁজছে। "যেখানে বয়স্ক লোকেরা স্বার্থবশে সর্ব প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ, সরকারগুলো জনকল্যাণের নামে সত্য গোপনে ও মিথ্যা প্রচারে সদানিরত, দেশের ও দশের প্রয়োজনে সেবা ও সুশাসনের নামে ক্ষমতারলীলা প্রদর্শনে সদা উৎসুক, যেখানে ন্যায়-অন্যায় প্রবলের স্বার্থে নির্ণীত হয়, গায়ের জোরকে যুক্তি হিসাবে চালানোই যেখানে রেওয়াজ, সেখানে যুব সমস্যাকেই সব দুঃখ-দুর্দশার আকর বলে আত্মদোষ গোপন রাখার একমাত্র উপায়। নইলে দু'চার হাজার টাকা বেতনের চাকুরে যদি উপরি গ্রহণ করেও সমাজে সম্মান পায়, তবে ছাত্ররাও দশ নম্বর বেশী পাবার আশায় নকল করলে নিন্দা পাবে কেন? 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'।"৩

সমাজ মানসে চিরায়ত আদর্শ ও মূল্যবোধে ভাঙ্গনঃ

আমাদের সমকালীন সমাজমানসে চিরায়ত আদর্শ ও মূল্যবোধে ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে এবং মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত নৈরাজ্য স্বাভাবিকভাবে বিদ্যালয় পরিবেশকেও আক্রান্ত করেছে। নর-নারী সম্পর্ক, পিতা-পুত্র সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচলিত মূল্যবোধে পরিবর্তন এসেছে। যে বাবা মাথার কাপড়ের স্থানচ্যুতিতে তার বড় মেয়েটির মাথায় ঢেলাকাঠ উদ্যত করেছিলেন সে বাবা দশ বছরের ব্যবধানে বয়েসী ছোট মেয়েটিকে সাইকেলের পশ্চাদারোহী হতে দেখে শাসনের হাত বাড়াননি।

আজকের দিনে যৌথ পরিবারের স্থলে ক্রমে ছোট পরিবার গড়ে উঠেছে। ফলে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের আদর্শের স্থলে অহংকারবোধের প্রাবল্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের জীবনাচরণকে প্রভাবিত করছে। বিজ্ঞান আজকের জীবনকে প্রাচুর্য এবং সম্ভোগের বিচিত্র আয়োজনে ভরে দিয়েছে। কিন্তু সীমিত সামর্থ্য সে বিচিত্রিত আয়োজনের অংশ ভাগী হতে পারে না বলেই লোভের হাত বাড়ায়। আকাঙ্খার অতৃপ্তি স্বীকৃত মূল্যবোধকে মেনে নিতে নারাজ।

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অনেকাংশে ধর্মীয় আচার ও অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে অনেকে মনে করেন, ধর্ম আমাদের সংস্কৃতির অংগ বলেই শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা

---

৩ আহমদ শরীফ, সামাজিক উপদ্রব ও রাজনৈতিক উপসর্গ, যুগন্ত্রণা, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ৩৪ বাংলা বাজার ঢাকা (১ম সং) পৃঃ ১৮।

www.pathagar.com

স্কুলের দায়িত্ব। অন্য কথায়, এঁদের মতে স্কুলে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নিয়েও আমাদের সাধারণ কোন সমঝোতা নেই। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা প্রসঙ্গে 'ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষা' এবং মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ উভয় কোর্সেই ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ "শিক্ষার্থীর মনে সুন্দর, সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গতানুগতিক ভঙ্গীতে নীতিবাচক নির্দেশাবলীর দ্বারা এ মূল্যবোধ জাগানো যায় না বরং আকর্ষণীয় গল্পমালাও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পরিসরে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মনে নৈতিক মূল্যবোধ ও নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করতে হবে।" ৪

পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক ব্যবস্থাঃ

স্কুলকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার যাবতীয় আয়োজনকে এক কথায় পাঠক্রম নাম দেয়া হয়। কাজেই অভিজ্ঞতার আয়োজনকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করে তোলার ওপরই স্কুলের সার্থকতা নির্ভর করে। সত্যিকার অর্থে পাঠক্রম প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু রূপায়ন কেবলমাত্র একটি দুরূহ কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের ফলে কেবলমাত্র আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাই পরিবর্তিত হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও অনুপযোগী ও অচল হয়ে পড়ে। ফলে সময়ের ব্যবধানে পাঠক্রমে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে পাঠক্রম রচনার ভার রয়েছে দুটি পরস্পর ভিন্ন কর্তৃপক্ষের ওপর। জনশিক্ষা পরিচালনালয় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং শিক্ষাবোর্ডগুলি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম রচনা করেন। অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিতরণের দায়িত্ব বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত।

বহুমুখী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের পাঠক্রমের একটি অন্যতম আকর্ষণ। এতে সাধারণ মৌলিক বিষয়গুলিসহ কতগুলি ঐচ্ছিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতার অনুকূলভাবী শিক্ষা ও বৃত্তিসহায়ক বিষয়গুলিই ঐচ্ছিক। বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্র-

৪। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ অনুচ্ছেদ ২·১৪

www.pathagar.com

সারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের নেতৃত্বে প্রাথমিক পর্যায়ে ২১টি মাধ্যমিক স্কুলে বহুমুখী শিক্ষার পাইলট প্রকল্প চালু হয়।

পরবর্তীকালে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও ক্রমে ক্রমে বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে। বহুমুখী শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারেঃ ১। বহুমুখী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি কি আদৌও আমাদের অর্থনীতি এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদানুযায়ী দক্ষতা ও কুশলতা সৃষ্টিতে সক্ষম? ২। মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার যথার্থ অনুপাত কি এবং তা কতদূর রক্ষিত হয়েছে? ৩। ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রবণতা কি কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের দ্বারা নির্ণীত? ৪। বহুমুখী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সার্থক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর আমরা হয়তো দিতে পারবো না। প্রথমতঃ জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও জীবিকার উপযোগী কুশলতার কোন হিসেব আমাদের হাতে নেই। ফলে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু আমাদের অর্থনীতির বিশেষ চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্বাচিত নয়। ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ পরীক্ষার ফলাফলই চূড়ান্ত হওয়ার ফলে বিশেষ প্রবণতা একটি কাগুজে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি, বহুমুখী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিষয় (যেমন, কারিগরি-শিল্পকলা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি) শিক্ষাদানের জন্য আমাদের বারোটি ট্রেনিং কলেজের কোথাও কোন ব্যবস্থা নেই। এ সকল বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে শিক্ষক তৈরীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছে শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনের অভাবে সে প্রশিক্ষণ কোর্স অচিরেই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের মনে রাখা ভালো যে কেবলমাত্র শিক্ষাসূচীর বৈচিত্র্য শিক্ষার কার্যকারিতার নিশ্চয়তা বিধান করে না। এ জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুশলী শিক্ষক।

সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতা পাঠক্রমের অতিরিক্ত নয়, সম্পূরক। শিক্ষার্থীর সামাজিক বৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে এ তৎপরতা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে সমৃদ্ধ করে। কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা শিক্ষাদানে, চিত্তবিনোদন ও অবসর যাপনের কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'ছোট একটি ছড়া লিখে আমার

www.pathagar.com

শিশুরা যখন দেয়ালে টাঙ্গায়, অথবা খেলার মাঠে অকারণ ছুটোছুটি করে তখন আমি তাদের দু'চোখে আনন্দের যে দ্যুতি দেখতে পাই, শ্রেণীকক্ষে সেটা সুলভ নয়'। ৫। আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে কতগুলি সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতার আয়োজন সহজেই করা চলে। যেমন, সাহিত্য ও সৃজনী, অভিনয়, খেলাধুলো ও শরীর-চর্চা, শখের কাজ ইত্যাদি। সাহিত্য ও সৃজনীর ক্ষেত্রে শহর ও মফস্বলের কিছুসংখ্যক স্কুলে সাহিত্য-বার্ষিকী' প্রকাশিত হয়। অন্যান্যদের যুক্তি—এটা ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু বার্ষিকী না ছাপিয়ে হাতে লিখেও বার করা চলে। এছাড়া দেয়াল পত্রিকাও শিক্ষার্থীদের কম আকর্ষণের বস্তু নয়। অভিনয় বলতেও তেমনি বোঝায় বার্ষিক নাট্যাভিনয়কে, খেলাধুলা বলতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে।

এগুলি লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আমরা ভাবিনে যে সারা বছর ধরেই, কি শ্রেণীকক্ষে, কি শ্রেণীকক্ষের বাইরে অভিনয় চলতে পারে এবং অভিনীত হতে পারে ইতিহাসের ও সাহিত্যপাঠের ছোট্ট সব গল্প, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের কাহিনী। বার্ষিক ক্রীড়ার আয়োজনও বার্ষিক, মানে বছরে ঘটা করে একদিন। তারপর পুরো বছরের জন্য ভুলে যাওয়া। শরীর-চর্চার শিক্ষক বিকেল না হতেই স্কুল থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, খেলার মাঠে গরু চরে, আগাছার সমারোহ বাড়ে। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর শখের কাজের খবরই আমরা রাখিনে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও আনন্দে কিছু শিক্ষার্থী হয় বাগান করে, নয় টিকিট বা ছবি সংগ্রহ করে।

বিদ্যালয় ভবন, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষোপকরণঃ

বিদ্যালয় ভবনের পরিসর, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়নে কতদূর উপযোগী তা ভেবে দেখবার বিষয়। আমাদের অধিকাংশ স্কুলের নির্মাণ প্রণালী, শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের তৎপরতার সহায়ক নয়। বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণের পূর্বে শিক্ষাগত প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা লাভ করে না বলেই এটা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সহায়ক সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণের অপ্রতুলতাও শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। শ্রবণ-দর্শন সহায়ক শিক্ষোপকরণের সপক্ষে আমাদের বক্তব্য জোরালো সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তির দোষ আসে না।

---

৫ Dorothy Issac Learning and Teaching, Harper & Brothers, New York, পৃঃ ৭১

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের প্রশ্নটিও আমাদের বিশেষ বিবেচ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড এ দুরূহ দায়িত্ব পালন করছেন। পাঠক্রম প্রণেতা ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের মধ্যে চিন্তার সমন্বয়, শিক্ষা-বর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মুদ্রণ ও আংগিক সৌকর্য সাধন, ইত্যাদি দিক সম্পর্কে টেক্সট বুক বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলিকে কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের যে কার্যক্রম ও পদ্ধতি অনুসৃত তা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। পরীক্ষাকালে আমরা তত্ত্ব ও তথ্যমূলক জ্ঞানের হিসেব নেই বেশী রকম। ফলে, পরীক্ষা হয়ে পড়ে স্মৃতি-নির্ভর, শিক্ষার্থীগণ তাদের পুরো শিক্ষা জীবনটাই মনে রাখার কসরৎ নিয়ে কাটায়। আধুনিককালে উন্নত দেশসমূহে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতিকল্পে নানা গবেষণা ও পরীক্ষণ চলছে। এ কাজে আমরা মোটেও হাত দেইনি বললে চলে। রচনামূলক প্রশ্ন এখনও আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলিকে অধিকার করে রয়েছে। এ জাতীয় প্রশ্নপত্রে শিক্ষণীয় বিষয়কে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা যায় না। একটি প্রশ্নপত্রে যেখানে পাঁচ বা ততোধিক বড় আকারের রচনা লিখতে বলা হয় সেখানে পাঠের সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন করা চলে না। এতে করে সত্যিকার অধ্যবসায়ী ছাত্রেরা ঠকে যায়। অধিকন্তু উত্তর পত্র পরীক্ষায় পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত রুচি, মতামত ইত্যাদির প্রভাব পড়ে। দেখা গেছে, একই উত্তরের জন্যই দশজন পরীক্ষক নম্বর দিয়েছেন দশ রকম।

বহিঃপরীক্ষা এবং বিশেষ করে, এক একটি শিক্ষাস্তরের শেষে একটি মাত্র গণ-পরীক্ষার ব্যবস্থাও শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব নিরূপণে অকিঞ্চিৎকর ও অবৈজ্ঞানিক। ফলে, শিক্ষার্থীগণের অহেতুক কালক্ষেপ এবং শেষ লগ্নে অত্যধিক ব্যস্ততা ও উৎকন্ঠা ফলাফলের ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে।

নির্দেশনা ও পরামর্শদানঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ গঠনে তথা শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে আজকের দিনে নির্দেশনা ও পরামর্শদান একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ, জাতীয় স্বার্থে দক্ষ ও কুশলী জনশক্তি সৃষ্টিতে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিপূরক।

নির্দেশনার মূলনীতিঃ

১। শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার স্বীকৃতি এবং

www.pathagar.com

তার উপযুক্ত পরিচর্যা ব্যবস্থা।

২। মানবিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার।

৩। শক্তি ও সম্ভাবনার অনুকূল শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন।

উপরে বর্ণিত মূলনীতির প্রেক্ষিতে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের কর্মসূচী শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা, বৃত্তি নির্বাচন, কর্ম সংস্থান, ব্যক্তিগত সমস্যা ইত্যাদি নিরসনে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে নির্দেশনার ব্যবস্থা নেই। আমাদের শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি পার হতে থাকে কিন্তু তাদের অনেকেরই ভাল করে জানা নেই তারা কি করছে, কি করতে যাবে বা তাদের দিয়ে কি হবে। নিজেদের শক্তি সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা সজ্ঞান নয়, কাজেই শক্তি সম্ভাবনার যথার্থ রূপায়নের কোন চ্যালেঞ্জই তাদের তাড়া করে না। নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যত গঠন, দেশ ও জাতির কল্যাণ তাদের কাছে বিশেষ অর্থে অর্থময় হয়ে উঠেনি। ফলে তাদের সামনে বর্তমান যেমনি বিভ্রান্তিকর, ভবিষ্যত তেমনি অনিশ্চিত।

শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

আমাদের গোটা শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষক সম্প্রদায়। বস্তুতঃ শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন তথা শিক্ষাক্রম, শিক্ষোপকরণ, শিক্ষা ভবন, আসবাবপত্র ইত্যাদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও তাদের কর্ম প্রাণতার অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৯জন এ অবস্থা দুঃখজনক হলেও সত্য। ১৯৭৩—৭৪ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা ও অনুপাত সম্পর্কিত নীচের সারণী দ্রষ্টব্য। ৬

স্তর	স্কুল	স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষণ প্রাপ্ত-দের সংখ্যা	শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত
মাধ্যমিক	জুনিয়র হাইস্কুল (৬ষ্ঠ—৮ম)	২,৫০০	৩,০০,০০	১৭,১৮৬	১৯%	১:২৩
	হাইস্কল (৬ষ্ঠ—১০ম)	৫,৫০০	১,৫৫,৯০০	৬৪,৮১৪		

৬ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট '৭৪ সারণী ১২ (গ)

www.pathagar.com

শিক্ষাবৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য চাই বিশেষজ্ঞসুলভ নিপুণতা। কাজেই শিক্ষকতার দ্বার সকলের জন্য অবারিত—এ ধারণা অচল। অবশ্য কেবলমাত্র নৈপুণ্য লাভ তথা প্রশিক্ষণই যথেষ্ট বিবেচিত নয়। স্বীয় বৃত্তির প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিকতাও একান্ত কাম্য। বর্তমান অবস্থায় উল্লিখিত দু'টি শর্তের কোন একটিও পুরোপুরিভাবে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষকদের দ্বারা পূরিত হবার নয়। কারণ বহুবিধ, কিন্তু ফল অবশ্যম্ভাবী শিক্ষামানের অবনতি এবং সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশের অনাকাঙ্খিত রূপ।

কার্যরত শিক্ষকঃ

আমরা অকপটে স্বীকার করব, আমরা অনেকেই অনেক কিছু হতে গিয়ে শেষটায় শিক্ষক হয়ে গেছি। যোগ্যতার অথবা অনুরাগের প্রশ্ন নয়, একটা অবলম্বন হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করছেন আমাদের শিক্ষিত তরুণদের একটি বিরাট অংশ। ফলে, সুযোগ এলেই তারা অন্য যে কোন পেশায় চলে যান। যারা থেকে যান তাদের চলে 'দিনগত পাপক্ষয়'। ফলে নিজের পেশার প্রতি যাদের শ্রদ্ধার ঘাটতি রয়েছে তাদের কাছ থেকে কোন আন্তরিক অবদান দুরাশা মাত্র। ".....সর্বক্ষণই তিনি ক্রোধান্বিত, সে ক্রোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে শ্রেণীকক্ষে যখন তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন একরাশ তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ আর সে ক্রোধের মার্জিত প্রকাশ ঘটে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত তরুণ নবাগত সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে হিতার্থীর কণ্ঠে বলেন, 'নিজে ডুবেছি, তোমরাও ডুবোনা যেন'।৭

আর্থিক সাচ্ছল্য ও সামাজিক মর্যাদা

স্বাধীনতা উত্তরকালে রাতারাতি উপযুক্ত প্রস্তুতি ও আর্থিক সংগতির খুব একটা বিবেচনা না রেখেই অসংখ্য বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পরবর্তী সময়ে পাশের হারের নিম্নগতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সৃষ্ট উৎসাহের ঘাটতির ফলে এ সকল স্কুল ধুঁকে ধুঁকে মরছে। উল্লিখিত স্কুল ছাড়াও বেসরকারী স্কুলের অধিকাংশই আর্থিক দিকে সচ্ছল নয়। প্রায় স্কুলেই শিক্ষকদের বেতনের দুটো রোল রাখা হয় একটি পরিদর্শন বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের জন্য, অন্যটি বাস্তবে যা ঘটে অর্থাৎ নগদ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বহন করে।

বলাবাহুল্য, প্রথমটিতে যিনি ৪৫০ টাকার ঘরে সই করেন, দ্বিতীয়টিতে তার জন্য বরাদ্দ থাকে ১৫০—২০০ টাকা। আত্মপ্রবঞ্চণার কি করুণ পরি-

৭ John L. Carreet-To Be A Teacher, An Introduction to Education.

www.pathagar.com

হাস। কিন্তু কাহিনীর শেষ এখানে নয়। স্কুলের জন্য সরকারী আর্থিক মঞ্জুরী, শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সুবিধের বিল ইত্যাদি পাবার জন্য শিক্ষকদের প্রাণান্তকর ছুটোছুটি যেখানে নিত্যকার ঘটনা সেখানে শিক্ষকগণ শ্রেণী কক্ষের ভিতরে—বাইরে কতটুকুই বা দিতে পারছেন।

আর্থিক সাচ্ছ্যন্দের সঙ্গে জড়িত সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন। 'মহান পেশা' নামের আড়ালে সত্য গোপনের অপচেষ্টা দীর্ঘকালের।

আর্থিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের এড়িয়ে যাওয়া ইচ্ছে প্রসূত। তাঁদের জন্য জাতীয় বেতন কমিশন আবারও কাজ করছেন। সকলের আশা, দ্রব্যমূল্যের গতির সঙ্গে তাদের বেতন ও ভাতার, কিছু অংশে হলেও সমতা আসবে। ব্যয় সংকোচের নীতি নিঃসন্দেহে কাম্য, কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে তা কাম্য নয়। *

শিক্ষার পরিবেশঃ সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের ইংগিত

এতক্ষণ আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার পরিবেশের বিভিন্ন দিক, প্রভাবকারী উপাদান এবং সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের শিক্ষার পরিবেশ আদর্শ থেকে অনেক দূরে—সুশিক্ষার পথে অন্তরায়ের হয়ত গোণাগুণতি নেই। অনেক কথাই আমরা তুলেছি, অনেক বিষয়ে আমরা তিক্ত ও বেদনাদায়ক প্রসংগের অবতারণা করেছি। কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে আত্মহননের জন্য নয়, আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অভিপ্রায়ে।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট হাতে এসেছে আমাদের। এই প্রবন্ধে শিক্ষার পরিবেশ ঘটিত যে সকল সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে তা শিক্ষা কমিশনের গভীর বিবেচনা পেয়েছে। কমিশনের রিপোর্টের আলোকে আমরা প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানের ইংগিতদানের চেষ্টা করব।

জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধঃ

পরিবর্তন কাম্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট আদর্শগত পরিবর্তনকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষকের বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা এখানে উল্লেখ্য। শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ গঠনে

* ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করেছিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করা হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

www.pathagar.com

আজকের শিক্ষার জগতে ছাত্র ও শিক্ষকের তথাকথিত ব্যবধান ঘুচে গেছে। পিতা-পুত্র সম্পর্কের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। আজকের দুনিয়ায় বাপ-ছেলে মুখোমুখি বসে পারস্পরিক সমস্যার কথা আলোচনা করেন, পরস্পর অভিজ্ঞতার বিনিময় করেন।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও পিতা-পুত্র ছিলেন পরস্পর ভিন্ন কক্ষচারী। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এ সামঞ্জস্য বিধানের কথা মেনে নিলেও সমাজ সংগঠনের চিরায়ত মূল্যবোধকে অস্বীকার করা চলে না। সমাজ চলার পথে যে জীবনাচরণ কল্যাণবহ প্রমাণিত হয়েছে তাকে সমাজের বহমানবতার প্রয়োজনেই সংরক্ষণ করতে হবে। মূল্যবোধ আরোপিত ব্যবস্থা না হয়ে স্বাভাবিক জীবনধারারই অংগীভূত হবে। জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনা আমদের তরুণ সমাজকে অনেক বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে সঠিক মতের ও পথের সন্ধান দিতে পারে। শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের উজ্জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে পরিবারের স্থান প্রথম এবং বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষকের বিশিষ্ট জীবনাচরণ, জীবনাদর্শ তাঁর শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ছাত্র অসন্তোষঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের তরুণদের মধ্যে অসন্তোষজনিত যে উচ্ছৃংখলতা লক্ষণীয় তার জন্য অনেকাংশে দায়ী মূল্যবোধজনিত বিপর্যয় ও আদর্শহীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরে আমরা আমাদের তরুণদের একদিকে যেমন কোন দেশ গঠনমূলক কর্মসূচী দিতে পারিনি, অন্যদিকে তেমনি তাদের সামনে বিশিষ্ট কোন জাতীয় চরিত্র বা আদর্শ তুলে ধরতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেও অবাঞ্ছিত পথে তাদের ঠেলে দিয়েছি।

পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতাঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতার ওপর জোর দিতে হবে। পাঠক্রম প্রণয়নে বিষয় বিশেষজ্ঞের সংগে বিষয় শিক্ষকগণও অংশ নেবেন। জাতীয় পাঠক্রম কমিটি এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা আশা করি, আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও কুশলী জনশক্তি গঠনে প্রস্তাবিত পাঠক্রম নতুন তাৎপর্য লাভ করবে।

সহ-পাঠক্রমিক তৎপরতা সংগঠনে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের কল্যাণ হস্তের স্পর্শের প্রয়োজনই সব চাইতে বেশী।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নঃ

পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উন্নতির

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে শিক্ষাবোর্ডসমূহ গবেষণা ও পরীক্ষণের জন্য সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষাবোর্ডের ঊর্ধ্বতন মূল্যায়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। তাঁদের কার্যধারা ও লব্ধ ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

নির্দেশনা ও পরামর্শদান:

নির্দেশনা ও পরামর্শদান কার্যক্রম প্রবর্তনে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ আশু কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে আপাততঃ প্রত্যেকটি স্কুলে সম্ভব না হলেও জেলাভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন। এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারটিও জরুরীভিত্তিতে সমাধা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি নির্দেশনা ও সংস্থানের জন্য সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব:

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক সম্প্রদায়। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা তাঁদের দায়িত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকের স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সমীচীন নয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা দিতে হবে।

উপসংহার:

উপরের আলোচনায় আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং আমাদের দেশকালের প্রেক্ষিতে তার সমাধানের ইংগিত দানের চেষ্টা করেছি। শিক্ষা একান্তভাবে জীবন-নির্ভর বলেই তাতে নিত্য নতুন মত ও পথের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, কোন একটি সমস্যা যেমন দুরতিক্রম্য নয়, তেমনি কোন সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধানও নেই। পারস্পরিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমরা কেবলমাত্র কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

www.pathagar.com

আলোচনা ঃ

তৃতীয় অধিবেশনঃ সময় ও তারিখঃ ৫ই এপ্রিল, '৭৬ অপরাহ্ন ২টা-৩০মিঃ থেকে ৪টা।

বিষয়ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবেশ

সভাপতিঃ ডঃ আবদুল করিম, ভাইস-চ্যান্সেলার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এই অধিবেশনে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকার শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের জনাব শামসুল কবীর এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব হাফিজউদ্দিন আহমদ, চাঁদপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব দবিরউদ্দিন আহমদ এবং শায়েস্তাগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুন নূর চৌধুরী।

পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনার অংশগ্রহণ করে **জনাব হাফিজউদ্দিন আহমদ** বলেন, শিক্ষার পরিবেশে বর্তমানে যে অবনতি লক্ষিত হচ্ছে তা কোন পক্ষের একার সৃষ্টি নয়। কিভাবে এই শোচনীয় অবস্থার সূত্রপাত হলো, স্বাধীনতা-উত্তর দিনগুলোতে কিভাবে শিক্ষাদানের পরিবেশ শিক্ষার প্রতিকূল হয়ে উঠলো, শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের অশ্রদ্ধা কিভাবে দিন দিন বেড়ে উঠলো, কোন্ কোন্ কারণে শিক্ষার্থীগণ পড়াশুনার চেয়ে নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের দিকে ঝুঁকে পড়লো, কিভাবে শিক্ষাঙ্গণের বাইরের ক্লেদাক্ত আবহাওয়া শিক্ষাঙ্গণগুলোতেও অনুপ্রবেশ করলো তা আমরা সকলেই জানি। এর জন্য কোন এক পক্ষকে দায়ী করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসক, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা সকলকেই সচেতন হতে হবে এবং একযোগে কাজ করতে হবে।

অধ্যক্ষ জনাব দবিরউদ্দিন আহমদ বলেন, মফস্বলের স্কুলগুলিতে নানাবিধ আর্থিক সমস্যা রয়েছে, এই সব সমস্যার দরুনই ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া এই সকল স্কুলের পরিচালনা কমিটিগুলির অহেতুক দৌরাত্ম্যের ফলেও সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ গড়ে

www.pathagar.com

উঠতে পারে না, এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা এবং স্কুল প্রশাসনের দুর্বলতার জন্য পরিচালনা কমিটিগুলি অনেকাংশে দায়ী। তিনি বলেন, শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সরকারী সাহায্য ও সুবিধাদি বন্টনের বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করতে না পারলে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ আশা করা যায় না। শিক্ষার অনকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষকদিগকে জীবিকার সমস্যামুক্ত করতে হবে। একজন শিক্ষক যিনি জীবিকার সমস্যায় অর্থনৈতিক দুরবস্থায় হতাশাগ্রস্ত তাঁর কাছ থেকে আমরা উন্নতমানের শিক্ষা আশা করতে পারি না। প্রাথমিক পর্যায় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ধারাবাহিক গতিকে ঠিক রাখতে না পারলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আশা করা বৃথা। তিনি বলেন, শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা, শহরের স্কুলগুলিতে যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে সেসব নেই। গ্রামের স্কুলগুলোর পরিবেশ এত নোংরা যে, ঐ সব স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায়-না। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে এই সব বৈষম্য প্রথমে দূর করতে হবে।

জনাব আবদুন নূর চৌধুরী পঠিত নিবন্ধের উপর আলোকপাত করে বলেন যে, শিক্ষার পরিবেশ সমাজ ও দেশের বাইরের কোন বিষয় নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশ ও সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিলে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হতে বাধ্য। গোটা সমাজ ব্যবস্হার অন্তর্নিহিত দুর্নীতি, ক্লেদ ও ক্লিন্নতা মোচনের ব্যবস্হা না করে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা ব্যবস্হায় স্বর্গ রচনার আশা করে লাভ নেই। তাই সমাজে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনাই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত। জাতীয় পরিকল্পনার অংশ না হলে শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ক্লেদ, কালিমা জড়ো হয়েছে তা একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। সচেতনভাবে সুস্হ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্হা ও কর্মসূচী অনুসরণ করলে আমরা জাতীয় জীবনকে ক্লেদমুক্ত করতে পারবো এবং জাতীয় জীবনে শৃংখলা ফিরে আসলে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটবে, শিক্ষাঙ্গণগুলোও তার থেকে বাদ যাবে না।

সভাপতির ভাষণে **ডঃ আবদুল করিম** বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার বৈষম্য দূর করে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্হাকে জাতীয়করণ করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন হলে সমস্ত উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্হাকে প্রাধান্য দিয়ে

www.pathagar.com

পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। বর্তমান হিসাব থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। তিনি বলেন, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে হবে, তারা যেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে ক্রীড়নক হয়ে নিজেদেরকে ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট না করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন হলে ছাত্র সংসদগুলিকে চিরতরে নির্বাসন দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম ও বিশৃংখলার ফলে ছাত্রগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুযোগ পায়। শুরুতে অধিকাংশ ছাত্র মূলতঃ নির্দোষ থাকে, লেখাপড়ার দিকে মনোযোগী থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কিংবা তাঁদের অনুগামী ছাত্রবৃন্দের দ্বারা প্ররোচিত না হলে এই সব সাধারণ ছাত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহী হয় না। এদেরই প্ররোচনায় এই সকল ছাত্র শ্লোগানে মেতে উঠে, হরতাল মিছিল সংগঠন করতে শুরু করে, ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয় এবং শিক্ষার মানের অবনতি ঘটে। তিনি বলেন, প্রাইমারী স্তরের শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি থেকেই ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিঁড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত। এই প্রাইমারী স্তরের শিক্ষার মান ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধন না করে উপর তলার পরিবেশ উন্নয়ন করার আশা করা যায় না। শিক্ষা ব্যস্থাকে জাতীয়করণ বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই করণীয়, এটা একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ; কেননা সরকারী ও বেসরকারী, শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বৈষম্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পথে একটা বিরাট অন্তরায়, এই কারণে তিনি বলেন, দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

কলেজ শিক্ষার পরিবেশ

হোসনে আরা শাহেদ
অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা মহিলা
মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকাঃ পড়াশুনা আজকাল আর নেহায়েৎ পুঁথিগত ব্যাপার মাত্র নয়। অবশ্য কোন কালেই তা ছিলনা, তবে যুগসন্ধিক্ষণের এ ক্রান্তিলগ্নে আর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এ জটিল মুহূর্তে আদপেই জ্ঞান আহরণকে পাঠ্য-পুস্তক সঞ্জাত বলে ভাবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। নেই বলেই শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 'পরিবেশ' এর প্রতিও সযত্ন দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে। পরিবেশ বলতে শুধু শ্রেণীকক্ষের অবস্থান বা কলেজের অংগনকেই বুঝায় না—এ শব্দটি এ ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থবহ। শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা, তার পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, অনুভূতির পরিশীলতা—এসব কিছুর সমন্বয়ই হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

স্কুল থেকে কলেজে এসে শিক্ষার্থী কী আশা করেঃ আলোচনার শুরুতেই ভেবে দেখা দরকার কলেজ পর্যায়ে একজন নবীন শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা কী। স্কুলের দশটি বছর শেষে জীবনের প্রথম ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে যে ছেলে বা মেয়ে, তার বয়স আমাদের হিসাবে ১৪। এ সময়টি মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এ সময় জীবন সম্পর্কে অনেক রঙ্গীন ছবি আঁকা একান্তভাবেই সম্ভব। চঞ্চল কৈশোরের অতিক্রমণীয় মুহূর্তে, দীপ্ত তারুণ্যের আবাহনে এ সময়টিতে মানুষকে সবচাইতে বেশী ভাব প্রবণ হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে যা সুন্দর, তা এই বয়সে আকৃষ্ট করে—যা কল্যাণকর, তাকেই সে বরণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কাজে কাজেই তার প্রত্যাশা হবে আদর্শগত। তার ধ্যান ধারণা একান্তই তাত্ত্বিক। তাই সে চাইবে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, সাজানো লাইব্রেরী, সুন্দর শ্রেণীকক্ষ, নির্মল প্রাঙ্গণ। চাইবে এমন এক পরিবেশ—যাতে তার মন ভরে থাকার ব্যবস্থা প্রচুর। তার আশা হবে হাসি-খুশীর ব্যবস্থা-পূর্ণ কমনরুম, বিস্তৃত

www.pathagar.com

খেলার মাঠ, অজস্র খেলার উপকরণ। অভাবের প্রতিফলন এ বয়সের শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখতে চায় না। কারণ, একটি নির্মম সত্যি হলো, আমাদের এ সমাজে শতকরা নিরানব্বই ভাগ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরিবেশে সচ্ছলতা নেই। নিত্যকার পারিবারিক সমস্যা তাকে পীড়িত করে—যার অধিকাংশই অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ভূত। তাই তার অবচেতনেই বুঝি যে কোন দৈন্যের প্রতি জন্মে থাকে প্রবল বিতৃষ্ণা। এ বয়সে বাস্তব বুদ্ধি ততটা দানা বাঁধেনা বলেই এ অভাবকে সামগ্রিক আলোকে বিচার করার ক্ষমতা বড় একটা হয় না। এ সময়ের দৃপ্ত তারুণ্য কেবলি পূর্ণতার প্রয়াসী। তাই গৃহ ছেড়ে শিক্ষা নিকেতনে তার সকল কল্পনার সফল প্রতিফলন দেখতে চায়। জীবনের দাবী বারংবার হতাশ হয়ে মাথা কুটে মরতে দেখলে সে ধৈর্য হারায়, ঘটে তার চিত্তবৈকল্য, মানসিক বিভ্রান্তি। সে ফ্রাষ্ট্রেটেড হয়ে পড়ে অল্পতেই। আদর্শভিত্তিক স্তর বলে ঔচিত্যের দিকেই এ বয়সে ঝোঁক হয় বেশী। তাই সে যেমন প্রয়োজনে প্রচন্ড পরিশ্রমী হতে পারে, তেমনি কামনা করে সংশ্লিষ্ট সকলে সমান নিষ্ঠাবান হোক। সে পেতে চায় আইডিয়াল শিক্ষক, যাঁর কথায় ও কাজে থাকবে সংগতি, যাঁর ছায়াতলে গড়ে নিতে পারবে সে নিজের জীবন। লক্ষণীয়, একজন ছাত্র বা ছাত্রী এ সময়টিতে খুবই কাজে লাগে যদি তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায়। তারুণ্যের ধর্ম নিয়েই থাকা নয়। শুধু শ্রেণীকক্ষে পাঠ গ্রহণেই তাদের সকল সাধ পূর্ণ হবার নয়, তারা মুক্তবিহংগের ন্যায় প্রকৃতির অসীমতাকে যেমন অনুভব করতে চায়, তেমনি তাদের বলাকা মন চায় অনাবিল বৈচিত্র্যে অবগাহন করতে। তাই সে কামনা করে এমন নিটোল পরিবেশ যা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ করবে সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণে। উদ্যমহীন আয়োজন ও নিরলস অবসর তার আশা-আকাংখাকে পংগু করে তোলে।

বাস্তবে কী পায়ঃ একথা বলাই বাহুল্য, বাস্তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতিফলন প্রায়শঃই থাকেনা। এর মাঝে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা তবু কিছুটা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দশা অতি করুণ। মোটামুটি সংগতি আছে, এমন বেসরকারী কলেজ আংগুলে গোনা যায়। বাদবাকি সবগুলোর অবস্থা সংগীন। এসব প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটরী যদিওবা থাকে তা নামে মাত্র, শ্রেণীকক্ষ সংকীর্ণ, হয়তো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অপরিসর প্রাঙ্গণ, অপ্রতুল আসবাবপত্র, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কোন কোন আর কোন কোন বা কেন, অধিকাংশ বেসরকারী কলেজেই চিত্তবিনোদনের বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা নেই—নেই খেলাধুলার প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন। মুক্ত বুদ্ধির বিকাশের সুযোগের অভাব এসব ক্ষেত্রে বড় প্রকট। বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে পরিবেশে তরুণ শিক্ষার্থী সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যান্ত্রিকতার শিকার

www.pathagar.com

হয়ে শিক্ষার্থী অবশেষে নীরস পাঠগ্রহণে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে জগদ্দল পাথরের মত তার উপর চাপানো হয় নিরাসক্ত পাঠ্যসূচী। আমাদের কলেজগুলোতে সব একই ধরনের শিক্ষার আয়োজন বিদ্যমান। কারিকুলামে ব্যাপকতা নেই, নেই একমাত্র জেনারেল ছাড়া 'ভোকেশনাল' ও 'টেকনিক্যাল' এডুকেশনের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা। তাই ভাল লাগছেনা—এমন বিষয়ও শিক্ষার্থীকে পড়তে হচ্ছে। বারংবার ব্যর্থতায় ও বিকল্প কিছু নেই বলে তাকে সেই নিরানন্দ পাঠের বোঝা বইতেই হয় বাধ্যতামূলক ঘানি টানার মত। ধরুন সেক্সপীয়র বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বানান লিখতে যে ছাত্রের কলম হোঁচট খায়, তাকে বাধ্য হয়েই সেক্সপীয়র বা ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার 'ক্রিটিক্যাল এ্যাপ্রিসিয়েশন' পর্যন্ত কন্ঠস্থ করতে হয়। ফলে তার এ পরিশ্রমটি মেধাজনিত না হয়ে 'স্নায়ুর চাপ' হিসেবেই বিবেচিত হয়। এ ধরনের যান্ত্রিক পাঠে সে মন দিতে পারেনা। পারবে না বলেই পাঠ ও পাঠজনিত সমগ্র পরিবেশের উপরই সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে।

আবার দেখা যায়, কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা পৌরনীতি, কিছুটা অর্থনীতি, তার সঙ্গে চারশ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী সাহিত্যে পিচ্চুটি গোলার মত গিলে খেয়ে গুটি গুটি বের হয়ে আসে যে শিক্ষার্থী ছাড়পত্র নিয়ে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ উজ্জ্বল হয় না। নিরন্তর উমেদারি আর তাবেদারিতে চোখে চোখে শর্ষে ফুল দেখে। বড়দের দেখে, চাকুরীর ইন্টারভিউ এ বা অফিসের ফাইলপত্রে চার বছরের আয়ত্ত করা সংজ্ঞাসমূহ কোন কাজে আসছেনা। তাই শিক্ষার্থী তার পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্র কোন কোন বিষয়ে কম্বিনেশন বানাবে বাতলে দেন তার অভিভাবক। মজার ব্যাপার সে বাতলে দেয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পারিবারিক ঐতিহ্য বা কৃষ্টির ছাপ প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর ইন্টারেষ্ট বা এ্যপটিচ্যুড্ নয়। অনেক ছাত্র বা ছাত্রী সেসনের শুরুতে, হয় সে সেকেন্ডারী বা ডিগ্রী যাই হোক না কেন, শিক্ষকের কাছে পরামর্শ চায়ঃ কোন্ কোন্ বিষয় নেবো? তার সরল চেহারায় যে জিজ্ঞাসাটি আসলে মূর্ত হয়ে উঠে, তা হলো—কি কি পড়লে ভবিষ্যতে চাকুরী পেতে সুবিধা হবে, অর্থাৎ জীবনের রূঢ় প্রয়োজনের কাছে সে সমর্পণ করতে প্রস্তুত নিজের শারীরিক ও মানসিক এবিলিটি। ভাল না লাগলেও সে সেই বিষয়সমূহ উদরস্থ করবে—যদি অথনৈতিক নিশ্চয়তার সন্ধান মেলে —যেন কঠিন ব্যামোতে তেতো ওষুধ গিলতে প্রয়াসী হতাশ রোগী। অসহায়, অনভিজ্ঞ, ভবিষ্যৎ-সন্ধানী শিক্ষার্থীর সে প্রশ্নের জবাব আমাদের প্রচলিত কারিকুলামে লেখা নেই। এ দুর্বিসহ এক ঘেঁয়েমির মাঝে শিক্ষার্থীর জন্য আছে আরেক উপসর্গ, যা কিছুমাত্র কম যায় না, শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান কোন্দল। আর অপ্রিয় হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই। আমরা শিক্ষিত শিক্ষক সমাজ চক্র সৃষ্টিতে অভূতপূর্ব পারদর্শিতা

www.pathagar.com

প্রদর্শনে সক্ষম হচ্ছি। পারস্পরিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমরা শিক্ষকেরা যেমন ছাত্রদের প্রতি আন্তরিকতায় নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিচ্ছি, তেমনি স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই অনেকটা, শিক্ষকসুলভ আচরণ ও শিক্ষাসুলভ উদারতা পরিহার করে চলেছি। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রত্যক্ষ শিকার ছাত্র সমাজ। তারা কখনো শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দেয়, কখনো ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতন দল পাকায়, দলা-দলির সুযোগে সস্তায় লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। এমনি করে ঘোলাটে জলে মাছ ধরার জঘন্য রীতি শিক্ষাঙ্গণে ও শিক্ষকদের কল্যাণে প্রবর্তিত, ফলে সমস্ত পরিবেশটাই হয়ে পড়েছে দ্রুত ক্লেদাক্ত।

নবীন শিক্ষার্থীর অনাবিল প্রত্যাশা নির্মমভাবে মার খায় কলেজ জীবনেই।

কেন পায় না, কেন নবীন শিক্ষার্থীর কল্পনার এহেন অবমাননা হয়, অপমৃত্যু ঘটে তার যাবতীয় প্রত্যাশার, তা নির্ণয় করা এ মুহূর্তে জরুরী। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রথমেই পরিকল্পনাবিহীন কলেজ সৃষ্টির কথা। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে বেসরকারী কলেজগুলো যেন বেওয়ারিশ সম্পত্তি বিশেষ। ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তি-প্রয়োজনেই এসব অধিকাংশ কলেজের জন্মলাভ ঘটেছে। স্বীকৃতি বা অনুমোদন প্রদানের পর এসব কলেজের অর্থকরী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যাবতীয় ভালো-মন্দের দিকেই সংশ্লিষ্ট তরফের অনুসন্ধিৎসা বা মাথা ব্যথা থাকেনা। এমন কি অনুমোদন প্রদানের সময় পর্যন্ত তলিয়ে দেখা হয় না—এসব কলেজের আদৌ প্রয়োজন আছে কি নেই। তাই দেখা যায় 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'র মতন কাগজে-কলমে স্বীকৃত বহু কলেজের অবস্থান নামে মাত্রই কেবল, বাস্তবে নেই। কোন কোন কলেজের ঘর আছে তো টুল-বেঞ্চি নেই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিষ্টার আছে তো ছাত্র-ছাত্রী নেই। সাইন বোর্ড সর্বস্ব এসব কলেজের সৃষ্টি মূলতঃ তিনটি কারণেঃ এক, ব্যক্তিস্বার্থ অর্থাৎ 'ইগো' চরিতার্থকরণ—কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাতা-রাতি 'শিক্ষানুরাগী' সীল অংগে ধারণ; দুই, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, স্বীয় দলগত উদ্দেশ্য হাসিলের পর কলেজকে বা অর্পিত বাৎসল্যকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া নিঃস্ব সিগারেটের মত; তিন, সরকার প্রদত্ত কল্যাণ ভাতা ভুয়া শিক্ষক তালিকা সাবমিট করে আত্মসাৎকরণ। কারণ যাই হোক ফলাফল অতি বেদনাদায়ক। ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠতে থাকল কলেজ। হয়তো একটি ভাল প্রাইমারী স্কুলও নেই যে এলাকায়, সেখানেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কলেজ। লক্ষণীয়, সোনার দাম যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকলো, জুয়েলারীও ওপেন হতে লাগলো সেই হারে। সুতো সংকটের সময় শুরু হয়েছিল বস্ত্র নিকেতন উদ্বোধনের হিড়িক। এর বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক কোন কারণ আছে কিনা জানা নেই, তবে তার সঙ্গে সংগতি রেখেই বোধহয় শিক্ষার নিদারুণ নৈরাজ্যের সময় গড়ে উঠতে

www.pathagar.com

থাকলো অসংখ্য কলেজ। নাম সর্বস্ব এসব কলেজ ছোঁয়াচে ব্যাধির মত দ্রুত সর্বনাশের বীজ ছড়ালো সমস্ত শিক্ষাঙ্গণে। নির্বিচারে কলুষিত হতে থাকলো শিক্ষার পরিবেশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করতেই হয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবধানের ব্যাপারটি। একথা সর্ব-জন-বিদিত যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে নজীর বিহীন বৈষম্য। সরকারী, বেসরকারী ও পাবলিক এ তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরাজমান। এর মধ্যে পাবলিক ক্যাডেট কলেজগুলোর অবস্থা উচ্চমানের আর সরকারী কলেজগুলো মোটামুটি সংগতিপন্ন সরকারের আশীর্বাদে। বিপর্যস্ত অবস্থা কেবল বেসরকারী কলেজগুলোর। শুধু আজ নয়, সেই সুদূর অতীত থেকেই বিমাতা সুলভ আচরণ পেয়ে আসছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ অধিকাংশেরই অনেক বেশী ছাত্র বিদ্যমান বেসরকারী কলেজে। এক জরীপে দেখা গেছে, দেশের শতকরা ৮৯জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছেন বেসরকারী কলেজগুলোতে, আর সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পরিমাণ ১১%। অথচ সরকারী সাহায্যের পরিমাণ দৃষ্টে গড়ে প্রতি ছাত্রের পেছনে বাৎসরিক খরচের যে অনুপাত দেখা যায়, তা হলো, সরকারী কলেজে প্রতি ছাত্র পিছু খরচের পরিমাণ তিন হাজার টাকা ও বেসরকারী কলেজে ছাত্র প্রতি খরচের পরিমাণ ত্রিশ টাকা মাত্র। বিস্তারিত বর্ণনা ও বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান ও পরিবেশ মোটামুটি সন্তোষজনক আর বেসরকারী কলেজে. এক কথায়, হতাশাব্যঞ্জক। এই যে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান, তার মূল কারণ, অর্থনৈতিক। নামে মাত্র সরকারী সাহায্য পায় বলে, বলা চলে ছাত্র বেতনই বেসরকারী কলেজগুলোর বেঁচে থাকার প্রধানতম উৎস। পাবলিক ডোনেশন আজকাল আদৌ মেলেনাঃ অতীতে এই ডোনেশনের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতো বহু কলেজ। যে ছাত্র বেতনের উপর এখন এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভরসা, সে ছাত্র-বেতনের অবস্থাও তথৈবচ। আজকাল নিয়মিত ও পুরোপুরি ছাত্র বেতন আদায় এক ভয়নক সমস্যা। এ দ্রব্য সংকটের চাপে জর্জরিত পরিবার প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসেই শোধ করতে পারে না, এমন কি বৎসর শেষে পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় গোটা বছরের দেনা এক কালীন শোধ করতে আসে যখন ছাত্র, তখনও তার মোটা অংশ মওকুফ না করে উপায় থাকেনা—একমাত্র মানবিক কারণেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এ পরোক্ষ চাপ ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানে আছে এর প্রত্যক্ষ চাপ, রেকারিং খরচ বেড়ে গেছে কম করে হলেও একশ গুণ। বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসের ছাত্র বেতন তদানীন্তন সরকার কর্তৃক এক ঘোষণায় মওকুফ করার ফলে এবং তার জন্য কোন সাবসিডি প্রদানের ব্যবস্থা না করায় এসব অনেক কলেজের দুর্দশা বেড়ে যায় সহস্ররূপে। ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্য চাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসছে। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে

www.pathagar.com

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে রোলস্ট্রেংগ্‌থ্‌ নেমে এসেছে এক চতুর্থাংশে। এ দৃষ্টে ছোট-খাট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা অনুমান করা অতি সহজ। ফলে রিজার্ভ ফান্ড থেকে শুরু করে প্রভিডেন্ট ফান্ড পর্যন্ত প্রায় কলেজে নিঃশেষ। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, রাজধানীসহ দেশের মফঃস্বলেরও বহু এলাকার কলেজে শিক্ষকদের মাসের পর মাস বেতন বাকী পড়ে থাকবার খবর আসছে। এমন কি কোন কোন কলেজে দু'তিন মাস পর পর ইনস্টলমেন্টে কিছু কিছু বেতন প্রদানের জোড়া-তালি ব্যবস্থা চলেছে। এই উপকরণে ও ব্যবস্থাপনায় যেমন, তেমনভাবে সংকট প্রতিফলিত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগও অধিকাংশ কলেজ বঞ্চিত সুযোগ্য টিচার থেকে, এমন কি ফুলটাইম শিক্ষক নিয়োগে পর্যন্ত তাঁরা অপারগ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পার্টটাইমার দিয়ে কাজ সারা হচ্ছে মাত্র।

আবার ছাত্র বেতন একমাত্র সম্পদ বলে ইনকাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কলেজগুলো ছাত্রের মান ও ক্ষমতা নির্বিশেষে এন্তার ছাত্র ভর্তি করে। অথচ সেই অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ না করতে পারায় কলেজগুলোর পরিবেশে বিশৃংখলা বিরাজ করে। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যেখানে সরকারী কলেজে ১৬ঃ১, সেখানে বেসরকারী কলেজ ৫০ঃ১। এমন অবস্থায় শিক্ষার পরিবেশ কতোখানি স্বস্তিকর, সহজেই অনুমেয়।

না পাওয়ার ফলে কী ঘটেছেঃ এই না পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর মনে নেমে আসছে হতাশা। পাশাপাশি দুটো বিপরীত ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে অতি দ্রুত শিক্ষার্থীর মনে কমপ্লেক্স জন্ম নিচ্ছে। সরকারী কলেজে পড়ুয়াদের কাছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টরা অনেক নিষ্প্রভ। এমনকি অভিজাত বেসরকারী কলেজের ছাত্রদের কাছেও অসচ্ছল কলেজের ছাত্ররা চুপসে থাকে। একই দেশে, একই শিক্ষা ব্যবস্থায়, একই সিলেবাসে পড়া ছাত্রদের 'মনে' ও 'মানে' এই যে বৈষম্য তার একমাত্র কারণ অর্থবন্টনে বৈষম্য। সরকারী কলেজে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী, ছাত্র বেতনও অনেক কম। তার প্রতি শিক্ষার্থীর ও অভিভাবক মহলের আকর্ষণ অধিক কিন্তু সীট সীমিত। তাই এস, এস, সি পরীক্ষার ফল বের হতে না হতেই ভর্তি প্রার্থীর বিরাট কিউ পড়ে সরকারী কলেজে। প্রত্যাখ্যাত যারা, তারা অগত্যা হিসাবে ভর্তি হয় বেসরকারী কলেজে। এই গত্যন্তরহীনতা তাদের মনে বছরের শুরুতেই নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে। এই ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় যখন শিক্ষার্থী ক্রমাগত দৈন্যের ছবি দেখতে পায় তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আগেই বলা হয়েছে, এটি সেই বয়স, যখন অভাবকে মেনে নিতে বিমুখ থাকে স্বপ্নিল মন। পারিবারিক চক্করের ব্যর্থতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেশী আশাবাদী করে তোলে তরুণ চিত্তকে। সে যখন তা না

www.pathagar.com

পায় এবং পাশাপাশি সরকারী কলেজের শিক্ষার্থীর পরিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তার তুলনা করে, তখন সে নিদারুণ হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়। যেহেতু অনেক অনেক গুণ বেশী ছাত্রের পড়ার দায়িত্ব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, সেই হেতু ছাত্র সমাজের এই বৃহত্তর অংশের মধ্যে এহেন হীনম্মন্যতার সৃষ্টি পক্ষান্তরে গোটা কলেজ শিক্ষার পরিবেশটাকেই বিষিয়ে তুলছে। কেননা এই একই কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরী হচ্ছে অপর একটি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর, যারা শিক্ষার মানে ও প্রতিষ্ঠান ও পারিপার্শ্বিকতার আভিজাত্যে নিজেদের কৌলীন্য দাবী করে এবং অন্যদের অনুকম্পার চোখে দেখতে শুরু করে। শিক্ষার্থীর মন ও মানসিকতার এই যে হৃদয় বিদারক বিভিন্নতা তা যে আমাদেরই প্রার্থিত জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী, তা আর বিশদভাবে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে মনে হয় না। দেখা যায় এই কারণে অনুভূতি প্রবণ বা মন-প্রধান শিক্ষার্থীর জীবনে সর্বনাশের বীজ রোপন হয় এই স্তরেই। সে সরকারী কলেজ থেকে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোল তা তার নিজের অপরাধে নয়। কাজেই ভাগ্য বা দৈবকে বরণ করে অদৃষ্টের উপর গা হেলে দেয়ার যে প্রবণতা তা এখান থেকেই জন্মাতে পারি বৈকি।

এক অভাব থেকে জন্ম নেয় অজস্র অভাবের। ভাল শিক্ষকের অভাবে (যেহেতু তাঁরা অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষাংগণ পরিত্যাগ করছেন) পড়ার মান ভাল থাকে না। এর উপর যুগোপযোগী ক্যারিকুলামের অভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অনীহা দেখা দেয় একদিকে, অন্যদিকে দেখা দেয় জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। এতে আমাদের প্রার্থিত প্রতিভার যেমন বিকাশ ঘট-ছেনা তেমনি ম্যান-পাওয়ার বিনষ্ট হচ্ছে বলে অপচয় হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। একজন শিক্ষার্থী যখন কলেজ পর্যায়ে পৌঁছায়, সে দু'টি স্তর শুধু অতিক্রম করে আসে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক। দুর্ভাগ্য, এই উভয় স্তরেই শিক্ষাসূচীর একই ধরনের বিন্যাস হওয়ার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এসে তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ স্ফুরণ কিংবা মেধার সঠিক বিকাশ হয় না। এরমধ্যে আবার সংযোজিত হয় উচ্চ শিক্ষার নামে অর্থহীন সিলেবাস। ফলে সে ক্রমাগত গ্রহণ ক্ষমতা হারাতে থাকে, মস্তিস্ক হতে থাকে নিষ্ক্রিয়। প্রাণহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের জটিল দাবী মেটানোর কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা না থাকায় শিক্ষার্থীর জীবনে নিরাশা দেখা দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে। অথচ প্রতিটি শিক্ষার্থী অনন্ত সম্ভবনার আধার। তার মধ্যে ইনটারেসট জাগিয়ে তুলে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হতে পারে। সাহিত্যে উৎসাহ না থাকলে সে ব্যর্থ হয়ে গেলো. কিংবা অংকে পারদর্শিতা নেই বলে সে অকর্মণ্য এ যথার্থ নয়। যথার্থ নয় দু'টি কারণেঃ প্রথমতঃ এই যে তার না পারা, তা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ব্যর্থতা। স্কুল লেভেলে দশটি বছর যে সে কেবল এনার্জী ক্ষয় করে তার সময় অপচয় করে এসেছে এ'তো মিথ্যে নয়। কেননা শুধু কলেজ পর্যায়েই নয়, সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিতেই

www.pathagar.com

রয়েছে ভয়ানক গরমিল। তাই শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা দেখে তার মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিরুদ্ধ রায় দেয়া সমীচীন হবেনা। দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্যহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু পড়ার জন্যই পড়া হচ্ছে বলে এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর মেন্টাল ট্রেন্ড, এ্যাপটিচ্যুড ইত্যাদি সহ কোন ট্যালেন্ট খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যায় শিক্ষক যখন প্রাণপণ ভাবে কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন সে বেঞ্চে বসে নতমুখে তখন আংগুলে দাগ কাটে মাত্র নয়তো ক্লাশের বাইরে চোখ মেলে থাকে। জবরদস্তি করে তাকে মনোযোগে বাধ্য করলেও সে হয়তো ব্ল্যাকবোর্ডে বা বাইরের দিকে দৃষ্টি দেবে, তবে তা যে কতো ভ্যাকেন্ট তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এর কারণ ঐ যে পাঠ, তা সে পরীক্ষার সময় কিছুদিন বেশী কনসেনট্রেশন দিয়ে রাত জেগে পড়ে নিলেই মুখস্থ করতে পারবে, আর তাতে 'পাশ' করতে যে বিঘ্ন ঘটবেনা তা সে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জেনে গেছে। আরও জেনেছে, শুধু উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া ঐ পাঠে আর কোনো ফায়দা নেই, অতএব এর জন্য এতো ব্যগ্র হওয়ারও কিছু নেই। যতো তরুণ বয়সেরই হোক অসহায় শিক্ষার্থী এ বুঝে ফেলতে পারে একমাত্র সহজাত বুদ্ধির জোরে।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক অস্থিরতাঃ এই দীর্ঘকালীন লালিত অ-ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর কালের সামাজিক পট-পরিবর্তন। দেখা গেল, কোন এক অদৃশ্য মন্ত্র বলে যেন আমাদের সামাজিক ভোল পাল্টে গেল রাতারাতি—আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কেমন যেন রূপ বদলের জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। আর্থিক লালসায় চিরকালের মূল্যবোধকে অকাতরে বিকিয়ে দিলাম—হন্যে হয়ে বিসর্জন দিলাম আত্ম-সম্মান। যেনতেন প্রকারে টাকার জোরে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেতে চাইলাম। রাহাজানি, লুটিং, হাইজাকিং ইত্যাদি হয়ে দাঁড়ালো নিত্যকার স্বাভাবিক সংবাদ। যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সেই হেতু এই অস্থিরতার জোয়ার এসে ঠেকলো এইখানেও। শুরু হলো ডিগ্রীর লোভে বিদ্যা চুরি—যার অপর নাম নকল'। কেবল চৌর্যবৃত্তিই নয় এ হলো লুন্ঠন। পড়াশুনা নয় সার্টিফিকেট লাভই হলো মোক্ষম ধ্যান। এর জন্য যাবতীয় জঘন্য কুকাজ সম্পাদিত হলো কিছু সংখ্যক কোমলমতি ছাত্র—ছাত্রীর দ্বারা,—আর পরিতাপের বিষয়, এতসব করেও সে সামাজিক দৃষ্টিতে রেহাই পেয়ে গেল। পরীক্ষা কেন্দ্রের হুল্লোড়, পরীক্ষা হলের অনাচার, শিক্ষকের প্রতি দুর্ব্যবহার, শ্রেণীকক্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, সব মিলে নারকীয় পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকলো শিক্ষাংগণগুলোতে। এমনি করে গোটা সমাজের বিবর্তনের ঢেউ এসে পাল্টে দিলো কলেজের পরিবেশকে। একজন শিক্ষার্থী কোন স্বতন্ত্র দ্বীপের বাসিন্দা নয়—সে গোটা পটভূমির ফসল। তাই যখন সে দেখতে পেল একটি মাত্র টেলিফোনে মুহূর্তে বিপুল অংক কামানো চলে, সম্ভব হচ্ছে

www.pathagar.com

জালিয়াতি, কালোবাজারিতে রাতারাতি লাল হয়ে যাওয়া, তবে আর সেই বা মেলা পরিশ্রম করে ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট করবে কেন, বিশেষ করে অধীত বিদ্যা যখন তার জন্য এনে দেবেনা কোন মুক্তির ঠিকানা? তার চাইতে এই ভাল এই গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসান। তাই তারা নগদ লাভেই মন দিল। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র স্বল্প সংখ্যক ছাত্র এমন দুর্বিনীত রূপ ধারণ করলেও পরবর্তী কালে মহামারীর মত গ্রাস করলো তা আমাদের অধিকাংশ ছাত্র সমাজকে। ছাত্র সমাজই হচ্ছে দেশের তরুণ সমাজ এবং যেহেতু কলেজ নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই হচ্ছে এই তারুণ্যের ধারক, সেই হেতু আর সব জায়গার চাইতে বিবর্তনের ছাপটি কলেজ পরিবেশেই প্রতিফলিত হল বেশী।

প্রতিকারের ব্যবস্হা করতে ব্রতী ছিলেন যে শিক্ষক সমাজ, তাঁরা মার খেলেন ছাত্রদের হাতে প্রকাশ্যে। জীবন বিসর্জন দিলেন ছাত্রের খুন-রাংগা হাতে। অপরদিকে কিছু সংখ্যক শিক্ষক গা ভাসালেন প্রবহমান প্রবাহে। ছাত্রদের গোপনে ব্ল্যাংক খাতা পাচার করলেন, প্রশ্ন ফাঁস করে দিলেন, প্রশ্নের জবাবও বলে দিলেন, এমনকি সহায়তা করলেন পরীক্ষার হলে পুস্তক সরবরাহে। এমনি করে পরিবর্তিত হাওয়া বুঝে উল্টো দিকে পাল তুলে দিলেন তাঁরা জীবন—তরণীর, তার ফলে দ্রুত অবনতি নেমে এলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে। বিশৃংখলা, আড্ডা, তাস, জুয়া, দলাদলি,মারামারি, খুনা খুনি—এমনি নানান বিভীষিকাময় পরিস্হিতিতে কেঁপে উঠলো কলেজ অংগন, এর সংগে সংযোজিত হলো নতুন ফাঁদ—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্রদের ব্যবহার। পলিটিক্যাল কারণে শিক্ষাংগণও ধুমায়িত হয়ে উঠল। মোটা মুনাফার লোভে ছাত্র বই ছেড়ে তুলে নিল মানুষ মারার কল পাঠ ছেড়ে প্রতিপক্ষ দমন নীতিতে হলো অধিক উৎসাহী। অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও হলেন ছাত্রের হাতের পুতুল। এমন কি প্রশাসনে যাঁরা, তারাও। দেখা গেল ছাত্র তার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তার পছন্দমত ব্যক্তিকে প্রশাসনে মনোনীত করছে কিংবা যিনি প্রশাসনে আছেন, তাঁকেও টিকিয়ে রাখার আশ্বাসে তাদের ক্রীড়নক বানাচ্ছে। ক্ষমতাবান ছাত্রদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলো শিক্ষাংগণের প্রতিটি কর্মী। মুষ্টিমেয় ছাত্র এ্যাকটিভ থাকলেও বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস ছিলনা কারোরই। দুর্নীতি চক্রের দাপটে আর দৌরাত্ম্যে সমগ্র কলেজ পরিবেশ হলো বিষাক্ত ও ক্লেদাক্ত। একদা সংগ্রামের সময় যে প্রেরণা পেয়েছিল তরুণ সমাজ, সফলতার পর পরিচালনার অভাবে দেখা দিল চরম ব্যর্থতা। সঠিক ও সময়োপযোগী নেতৃত্বের অভাব প্রত্যক্ষ ও দীর্ঘস্হায়ী বিরূপ ছাপ রাখল ছাত্র সমাজের উপর।ভুলের সংগে ভুল যোগ হলে যে ভুল শুধরে যায় না, বরং তা বেড়েই চলে, তার প্রমাণ হলো ছাত্র অস্হিরতা নিরসনে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করণ, অটোপ্রমশনের ব্যবস্হা, ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী পরীক্ষা বার

www.pathagar.com

বার পিছিয়ে দেয়া। যেন দুষ্টক্ষতে ভুল মলম লাগানোর প্রয়াস হলো। অরাজকতা স্তিমিত হলোনা, প্রশমিত হলোনা, ছড়িয়ে পড়লো নব কলেবরে। দুঃখের ব্যাপারে, যতদূর মনে পড়ে কোন শিক্ষাবিদের অনুমোদনক্রমে এসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, হয়েছিল প্রশাসনিক নির্দেশে।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতিঃ প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি বহুলাংশে এই বিমুখ পরিবেশের জন্য দায়ী। প্রথমেই চোখে পড়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভাষা শিক্ষায় দীনতা ও ভাব প্রকাশে ব্যর্থতা। উচ্চ মাধ্যমিক এমন কি, ডিগ্রী ক্লাসের বিদ্যার্থীর পর্যন্ত ভাষা জ্ঞান থাকেনা। এর কারণ শিক্ষার্থী এইচ. এস. সি. পর্যন্ত ইংরেজীর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ছাত্রদের ইংরেজীর বিভীষিকা সর্বজন বিদিত। বিদ্যার্থীকে ভীতবিহ্বলচিত্তে স্বীকার করতে শোনা যায় 'আমি তো সারাক্ষণ ইংরেজীই পড়ি। অতি রঞ্জিত নয়। কিন্তু তবু তার ইংরেজীর নম্বর পাশের ঘরে উঠেনা। বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থী প্রতি বছর ব্যর্থতা বরণ করে চলেছে, তার মূলেও কিন্তু ঐ ইংরেজীর প্রতিবন্ধকতা। সিলেবাসে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী থাকলেও আসলে আমরা দেখি শিশু অ, আ, আর এ, বি, পাশাপাশি শিখছে। দশটি বছর ইংরেজী পড়েও আর উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের মত প্রতি ক্লাসেই ইংরেজীর প্রাধান্য দিয়েও শিক্ষার্থীর এ ভরাডুবির একমাত্র কারণ আমাদের গলদে ভরা শিক্ষা পদ্ধতি। আরও একটি অপ্রিয় সত্যি হলো—ইংরেজীর যোগ্য শিক্ষকের অভাব। ভুল বানান, ডিফেকটিভ উচ্চারণের শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যে পাঠ নেয়, ধরে নেয় এ কেবল মুখস্হরই বিষয়, গ্রহণের নয়। পাঠদান যাই হোক, প্রশ্নপত্র কিন্তু বরাবরই অতি মাত্রায় ষ্ট্যান্ডার্ড হতে দেখা যায় যা বিপুল পরিমাণ নম্বর ভর্তুকি (গ্রেস) দিয়েও পার্সেনটেজের বিচার শেষ রক্ষা হয়না। সেই সঙ্গে বর্তমানে আছে অসহায় মাতৃভাষা। দীর্ঘদিনের অবহেলিত এ ভাষা বর্তমানে অতি উৎসাহের হিড়িকে যার পর নাই বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে। আধুনিকীকরণের নামে যেমন তেমন বানান একটি ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে বলা যায়। আর এ সমস্যা অতি মারাত্মক শিক্ষার্থীর জন্য। হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ, তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ, দন্ত্য স, এসব বিভ্রাট হয়তো একালে এমন কিছু নয়, কিন্তু এ বিরোধ পরীক্ষার্থীর সমূহ বিপদের কারণ। টীচার ও পরীক্ষক দুইমত পোষণ করেন যদি, ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেচারা পরীক্ষার্থী। এছাড়া মাতৃভাষা বলেই একে যেমন সহজ করে দেখা হয়, বিদ্যার্থীর কাছে প্রাথমিক স্তরে এ তেমন সহজ নয়। যেমন আঞ্চলিকতার প্রভাব কাটাতে পারেন না অনেক উঁচুদরের শিক্ষক পর্যন্ত, তেমনি পারেন না বাংলার চর্চা করা স্পেশালাইজড টীচারও। নিজে ত্রুটি মুক্ত না হলে শিক্ষার্থীর সংশোধনের প্রশ্ন অবান্তর আর তাই দেখা যায়

www.pathagar.com

আঞ্চলিকতার ছাপ বানানেও বিদ্যমান। জগাখিচুড়ীর মধ্যে পড়ে আমাদের শিক্ষার্থী না জানে ইংরেজী না জানে বাংলা। বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হওয়াতে প্রকাশ ক্ষমতা না থাকায় ব্যর্থ হচ্ছে পাইকারী হারে। শিক্ষার মান ও রূপ যাই হোক্ প্রতিটি ক্ষেত্রেই থ্রি আর শিক্ষার মূল বলে বিবেচিত। ডিগ্রী যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন, কর্ম জীবনে কেবলমাত্র কাজে লাগছে লেখার সাবলীলতা এবং বাচন ভংগীর সপ্রতিভতা ও গুছিয়ে বলার ক্ষমতা। প্রাথমিক পর্যায়ে এর মাধ্যমেই ব্যক্তির শিক্ষার পরিশীলতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা চলে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ মৌলিক দিকটা নিতান্ত অবহেলিত। তাই এ ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষিতের ইংরেজী ও বাংলা জ্ঞান ঐ ক্যাজুয়েল লিভ এর এ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত সীমিত।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি আদৌ যুক্তিসংগত নয়। আমরা এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর ইগনোরেন্স যাচাই করার স্কোপ পাচ্ছি, মেরিট নয়। এই সিসটেমের কুফলের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণে না গিয়েও মোটামুটিভাবে বলা যায় এ পদ্ধতিতে ছাত্রের ফলাফল একমাত্র ফাইনাল পরীক্ষা নির্ভর বলে তার সারা বছরে করার কিছু থাকেনা। ক্লাশে অমনোযোগিতা, টিচারের সঙ্গে অসহযোগিতা ইত্যাদি সমস্যা জাতীয় সকল অনিয়মই এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত। অথচ সারা বছরের কার্যাবলীর এসেসমেন্ট হওয়া উচিত সারা বছর ধরেই বিভিন্ন টেস্ট টিউটোরিয়েল ও আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে। তাতে পরিবেশে শৃংখলা ফিরে আসবে, ছাত্র সচেতন থাকবে আর শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের মূল উদ্দেশ্য বজায় থাকবে। সবচাইতে যা প্রধান তাহলো এতে পরীক্ষায় নকলের অবকাশ থাকবে না পরীক্ষা কেন্দ্রের দুর্নীতি আপনা-আপনিই বন্ধ হবে।

আমাদের প্রচলিত রীতিতে মেধার যে স্বীকৃতি আছে তা নেহায়েৎ তত্ত্বগত। দিবানিশি দেখছি, ভর্তি বা চাকুরী যাই হোক, প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েও ক্ষেত্র বিশেষে পরিচয়ের গুণে উতরে যায়। শিক্ষার্থীর মনে এতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পরিপন্থী।

শিক্ষার ব্যয় নাগালের মধ্যে নেই। প্রচলিত ব্যবস্থায় ধনীর সন্তান ভালো শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে অথচ সংগতিহীনের মেধাবী সন্তান শিক্ষার দ্বারে মাথা কুটে মরছে। এতে করে একটি শ্রেণী সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা হচ্ছে—যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে আমরা কাগজে-কলমে নিরন্তর লড়াই করার শপথ নিয়ে থাকি। শিক্ষাংগণে প্রতিকূল পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় ঠিক এই কারণেও।

www.pathagar.com

এর অবসান কেন হওয়া উচিতঃ এই পরিস্থিতির অবসান আশু প্রয়োজন। এই অরাজকতা, এই অব্যবস্থা, এই অস্থিরতা, আর জিইয়ে রাখা সংগত নয়। শিক্ষা পরিবেশের এ বিশৃংখলা পরিণামে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি-বীতশ্রদ্ধা ও অশিক্ষিতের শিক্ষিতের প্রতি অশ্রদ্ধাই বৃদ্ধি করে চলবে মাত্র।

কী করে তা করা যায়ঃ মনে হয় ছাত্রকে পাঠে মন দেয়ার শুকনো উপদেশ এ মুহূর্তে হবে শুধু কথা দিয়ে চিড়ে ভেজানোর প্রয়াসের মত। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাস্তবমুখী চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। একাডেমিক এ্যাটমোসফিয়ার বলতে গেলে যা বোঝায় তার সৃষ্টি করতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। সেই পরি-কল্পনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজনঃ শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পুর্নবিন্যাস। প্রচলিত এই উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা আসলে অশিক্ষার নামান্তর। এজন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে, লক্ষ্য দিতে হবে সময়, প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীর মানসিকতার দিকে। যুগোপযোগী চাহিদা ও পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী শিক্ষার্থী যাতে কার্যকরী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা-লাভ করে, তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া কর্তব্য। কেবল পড়ার জন্যই পড়ার আর দরকার নেই। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ কাম্য-যাতে বিদ্যার্থী শিক্ষার আনন্দ লাভের সংগে সংগে জীবনের সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ্য পাবে। পুঁথিগত শিক্ষা আজ অর্থহীন ও অসার বলে বিবেচিত। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার উপর প্রধান্যের বিষয়টি আজ অত্যন্ত জরুরী। দেশের বর্তমান এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জেনারেল এডুকেশন মেধাবী ও অতি উৎসাহী মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমিত থাকাই কল্যাণকর। ঢালাওভাবে প্রতিটি কলেজে একই ধরনের শিক্ষার আয়োজন প্রবর্তিত থাকায় এসব কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ব্যক্তিজীবনে স্বাবলম্বী হতে বেগ পাচ্ছেন একদিকে অপরদিকে হচ্ছে অহেতুক অপচয়। এমন কি, আমরা জানি, শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বহনকৃত খরচ ও জাতীয় সম্পদ। সুতরাং তারও সঠিক প্রয়োগ হওয়া দরকার বৈকি। এ দরিদ্র দেশে এস, এস, সি, পাশের পরেও কম করে চার বছর লাগছে কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। ভাগ্য অনুকূল না হলে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়না) তো এই চার বছর ছয় কি সাত বছরও গড়ায়। পরীক্ষার্থীর যে ব্যর্থতা তা অভিভাবকের অর্থনৈতিক দুর্দশাই ডেকে আনে মাত্র। এই সুদীর্ঘকাল ধরে অর্থ জোগান অনেকের পক্ষেই হয়ে দাঁড়ায় প্রাণান্তকর ব্যাপার। আবার পাশ করে বের হলেই তো চলবে না চাকুরীর নিশ্চয়তা অত সহজে তো মেলার নয়। এর জন্য হয়ত কেটে যেতে পারে আরো ক'টি বছর। বিপর্যস্ত অভিভাবক কেবল বিপন্নই হতে থাকবেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধার দেনা করে, এমন কি জমি-জমা বন্ধক রেখেও পুত্রের পড়ার রসদ চালান হয় কেবল ভবিষ্যৎ ভেবে। সে ক্ষেত্রে ডিগ্রী বা পড়াশুনা যদি এমন অন্তঃসারশূন্য

www.pathagar.com

ফল প্রদর্শন করে পড়ালেখায় প্রয়োজনীয়তার প্রতিই ধিক্কার আসে না কি? ঠিক এই কারণেই একজন অশিক্ষিত গরীব অভিভাবক ছেলেকে পয়সা খরচা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে রাজী হন না। বলেনঃ দু'কলম পড়ে কি হবে? চাকুরী তো চট করে পাবে না। বেহুদা সময় নষ্ট—তার চাইতে পিতৃ পুরুষের কাজ-বাজই করুক পেটে দানা পড়বে অন্ততঃ। এজন্য আফসোস করার কিছুই নেই কেননা সাধারণ মানুষ দেখে বা ঠেকেই শেখেন—তত্ব কথায় ভোলেন না। জ্ঞানের প্রসারের জন্য যে যুগে এমন জল্পনাকল্পনা, সে যুগে কিনা বিদ্যার প্রতি এমন অনীহা এ তো আর কোন কারণে নয়, কেবল পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগের ও জীবনের চাহিদার সার্থক প্রতিফলন হলে এমন নৈরাশ্য আর শিক্ষার পরিবেশে বিরাজ করবে না। অপরদিকে শিক্ষার্থীও সজীব অংশগ্রহণে এগিয়ে আসবে। জীবনের সংগে মিশে যাবে বলে শিক্ষার্থী, একাত্মতা খুঁজে পাবে শিক্ষার মাঝে। এ অনুভূতির প্রত্যক্ষ অবদান থাকবে পরিবেশ উন্নীত করণে।

পরিবেশ তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রাধান্য দিতে হবে কো-ক্যারিকুলার কার্যাবলীর উপর। পরিকল্পনা নিতে হবে চিত্ত বিনোদনের যথাযথভাবে। বিনোদনমূলক বিতর্ক সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষারব্যবস্হা পরিবেশ নির্মল করার জন্য অতীব জরুরী। এতে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ থাকবে, মন ভালো থাকবে, গঠনমূলক কাজের স্পৃহা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে—আর স্বস্তির আনন্দ পাবে বলে ধীরে ধীরে ফিরে আসবে আত্মঘাতী অস্হিরতা থেকে। বিশুদ্ধ বিনোদন সৃষ্টিশীল কাজের প্রেরণা। কলেজগুলোকে বৃহত্তর স্বার্থে ও পরিবেশের মংগলার্থে তেমন ব্যবস্হা করতে হবে।

অবকাশ থাকা চাই প্রতিটি শিক্ষাংগণে খেলাধুলার। আমাদের দেশের বিশেষ করে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তাংগনের অভাব বড় প্রকট। এ অভাবটি সরাসরি মেটানো না গেলেও ছাত্র—ছাত্রীর জন্য শহরে এলাকা ভিত্তিক খোলা-মেলা মাঠের ব্যবস্হার উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই সংগে প্রয়োজন খেলার উপকরণের ব্যবস্হা। সরকারী দায়িত্বে খেলাধুলার সরঞ্জামাদি কখনো বিনামূল্যে, কখনো সুলভে সরবরাহ করা গেলে অনেক অসচ্ছল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ পাবে।

শিক্ষার্থীর মন সদা সতেজ রাখার জন্য এমনকি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য আন্তঃ প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার উপর সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য। এতে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কূপ-

www.pathagar.com

মন্ডুকতা, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক সংকীর্ণতা দূর হবে, বিনিময়ে সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সমঝোতার স্পৃহা বাড়বে। বিচ্ছিন্ন ছাত্র সমাজের মধ্যে আজ ঐক্যের বড় প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লোক্যাল ফ্যাক্টরীর সংযোগ সৃষ্টি করায় মতামত প্রদান করছেন অনেক চিন্তাবিদ। তাঁরা জোর দিচ্ছেন ফ্যাক্টরী বেজড ইন্‌ষ্টিটিউশনের ওপর। এতে শিক্ষার্থী পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ দেখা ও শেখার সুযোগ পাবে, তার পরিধির প্রসার ঘটবে, গন্ডীর ব্যাপকতা বাড়বে আর চিন্তা ও বাস্তবে সংগতি ও সমন্বয় খুঁজে পাবে। সর্বোপরি ছাত্রের সংস্পর্শে সর্বক্ষণ থাকার ফলে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার পুঞ্জীভূত অনাচার দূর হওয়ার আশা করা যায়। এতে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান যুগপৎ উন্নত হবে।

কলেজগুলোকে প্রচলিত প্রথা ভুলে সার্থক মানুষ গড়ার কাজে সর্ব শক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং তা শুধু নীতি হিসাবে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হলেই চলবে না। বাস্তবেও উদ্দীপনার প্রমাণ রাখতে হবে।

প্রতিটি কলেজে একই ধরনের জেনারেল এডুকেশনের ব্যবস্থা না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যেন এক একটি ওয়ার্কসপের ভূমিকা নিতে পারে, সে লক্ষ্য থাকতে হবে। সমাজের প্রতি থাকতে হবে কার্যকরী অবদান—যাতে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপন শেষে বেকার বসে থাকার অবকাশ না থাকে। যেহেতু সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিরাট কলেবরে আর নেই এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক কারিগরি, পেশাগত, বিভিন্ন ধরনের বাস্তব পেশা ভিত্তিক শিক্ষার আজ অতি প্রয়োজন, সেই হেতু কলেজগুলোকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। এক একটি কলেজ এক একটি এলাকার ভার বহন করতে হবে ও ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে।

যুগের প্রয়োজনে হাতে কলমে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম বলে বিবেচিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে এ ধরনের শিক্ষার আরো একটি পরোক্ষ ফল ও আছে। শিক্ষার্থী সর্বদা ব্যস্ত থাকছে বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' জাতীয় উৎপাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আনন্দ মগ্নতা শিক্ষার্থীকে ধ্বংস মূলক কাজে আত্মনিয়োগ থেকে প্রতিহত করবে—যা সুন্দর, প্রার্থিত শিক্ষা পরিবেশ গঠনের সহায়ক হতে পারবে।

সেই সঙ্গে প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষা প্রবর্তনের। আপাতঃদৃষ্টিতে এ স্কীমটিকে কলেজ পরিবেশ বহির্ভূত বিষয় মনে হলে ও একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বিদ্যমান। আমরা

www.pathagar.com

জানি পরিবার হচ্ছে মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবার ও পরিবেশের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শিক্ষার্থীর পরিবার বাদ দিয়ে শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আজ এডাল্ট এডুকেশনের দ্রুত বিস্তার অবশ্য প্রয়োজনীয়। লক্ষণীয় নকলের হিড়িকের সময় কেবল যে ছাত্র শিক্ষক অপরাধী ছিলেন, তাতো নয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারই যেন সস্তা ডিগ্রীর লোভে মেতে উঠেছিল। কয়েক সন্তানের পিতা, মাতা এমনকি পিতামহ, মাতামহ পর্যন্ত হন্যে হয়ে পড়েছিলেন নকলের সুযোগে, বিশৃংখলার বদৌলতে এস, এস, সি, বা এইচ, এস, সি, কোন কোন ক্ষেত্রে ডিগ্রীর সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য। পরিবার থেকে প্রশ্রয় পাওয়াও ছিল উচ্ছৃংখলতার আরেকটি কারণ। এক কথায় বলা চলে পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় অরাজকতার সহায়ক হয়েছিল বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে। সঠিক পারিবারিক শিক্ষার প্রভাবে এ বোধ পরিশীলিত করা সম্ভব।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নটি পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হলেও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ বিরাট ব্যবধান টিকিয়ে রাখা যাবেনা। সুদূর অতীতে প্রবর্তিত উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি স্বাধীন দেশের ক্লাইটারিয়া হতে পারে না। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যোগ্যতম নাগরিক গড়ে তোলার যে মহান দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ন্যস্ত, তা বিশ্বস্তভাবে পালন করা যাবেনা—যদি ক'টি মাত্র মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রতি অধিক যত্ন নেওয়া হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের এ ব্যবধান জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে,—সৃষ্টি হবে দু'টি বিপরীত প্রান্ত। আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এও জানি এ আমাদের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে পর্বত প্রমাণ পার্থক্য বিরাজমান তা আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেও করছিনা। এ ও তো ঐ একই দেশের একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিষাক্ত ফলশ্রুতি। এর মূলে কুঠারাঘাত করতে হলে এখুনি সতর্ক হতে হবে। একমাত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের মাঝেই এর সমন্বয় যেমন সম্ভব তেমন আর কিছুতে নয়। অধুনা দেখা যায়, চিত্ত বিনোদনের নামে কিছু কিছু সচ্ছল ও সফল প্রতিষ্ঠানে অধিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা। অধিক বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় শরীরের সব রক্ত মাথায় জমা হলে যে বিপত্তি হয়, এক্ষেত্রেও তেমন দুঃখজনক পরিণতি ঘটার আশংকা বিদ্যমান।

প্রেরণা জাগাতে হবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। একথা মানতে হবে শিক্ষকদের মধ্যেকার আদর্শভিত্তিক ঐক্যবোধ ছাত্র হৃদয়ের অস্থিরতা মোকাবেলার প্রত্যক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। এর জন্য প্রয়োজন, শিক্ষক সমাজকে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান। সেই সঙ্গে দিতে হবে সামাজিক

www.pathagar.com

সম্মান—দিতে হবে জীবন যাপনের ন্যূনতম সংস্থান ; পেটে ভাত থাকলে পিঠে কিল সওয়া যায়, কিন্তু নিত্য সংকট জর্জরিত শিক্ষক সমাজ মানবেতর জীবন যাপন করছেন। পত্রিকার খবরে জানা যায়, একজন শিক্ষক জীবনের মূল্যবান সংগ্রহ দুর্লভ পুস্তকারাশি ফুটপাথে বিক্রি করেছেন। শোনা যায় শিক্ষকের স্ত্রীর অলংকারাদি থেকে শুরু করে ঘটি-বাটি বিক্রির সংবাদ। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় চেতনার খাতিরেই আজ বড় প্রয়োজন শিক্ষার জাতীয়-করণ। স্বাধীনতার পর শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স জাতীয়করণ হয়েছে, কিন্তু সব চাইতে অধিক প্রয়োজন যে শিক্ষা, তারই জাতীয়করণের জল্পনা-কল্পনা আজ অবধি শুরু হলোনা। শিক্ষার স্থান ও সমকাতারে নির্ধারিত করা কল্যাণকর। শিক্ষার প্রধান্যের অর্থ, শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় বৈষম্য ও অনাচারের সার্থক অবসান।

শিক্ষার নামে শিক্ষা বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান যেন আর বৃদ্ধি না পায়, তার প্রতি তীক্ষ্ন নজর রাখতে হবে। শিক্ষাকে কারো ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ভাববার অবকাশ থাকবে না, অবশ্য আনন্দের কথা ইতিমধ্যেই নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি এ্যমালগেমেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট এখনো বিবেচনাধীন। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষার নামে অপপ্রচার বন্ধ হবে।

ছাত্রদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে আর যেন ব্যবহার করা না হয়, এজন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা অবশ্য প্রয়োজন—প্রয়োজন তাদের সুস্থ চিন্তাভাবনা এবং মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ ও প্রকাশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের গৌরবময় অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর-ণীয়। মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়, একুশের সেই অম্লান চেতনা ও প্রেরণা ছাত্র সমাজেরই। সেই ঐতিহ্যবাহী অতীতকে স্মরণ করতে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—ছাত্ররা দেশের কল্যাণেই আজ পারস্পরিক দ্বেষ, বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবেন। তাঁরা কারো উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হবেন না। ছাত্র সমাজের আজ আত্মবিশ্লেষণের সময় উপস্থিত— তাঁরা কেবল দেশের সন্তানই নন, পরম সম্পদও বটে। আর ঠিক এই ব্যাপারেই প্রয়োজন আদর্শবান শিক্ষকের—প্রয়োজন ছাত্রদের সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বনের। তাই আজ অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছাত্র—শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি। ছাত্র—শিক্ষক কো-রিলেটিভ। শিক্ষক ছাত্র ব্যতিরেকে অর্থহীন। দুর্ভাগ্য আমাদের, অবস্থা বিশেষে সম্পর্ক এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে মনে হয় ছাত্র-শিক্ষক দুটি প্রতিপক্ষ। এরও কারণ অব-শ্যই অর্থনৈতিক বিবর্তন। অতীতে শিক্ষকের গৃহ ছিল ছাত্রের বিদ্যাপীঠ, গুরু গৃহে গিয়ে সম্ভব ছিল গুরু দর্শনের। কাজেই তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের। শিক্ষককে ভক্তি করাই ছিল ছাত্রের শিক্ষার

www.pathagar.com

প্রধান প্রেরণা। এর পরে বহু স্তর পার হয়ে এসেছি আমরা। আমরা আজ দেখছি—শিক্ষক আজ পৌঁছান ছাত্রের বাড়ী—টাকার বিনিময়ে করেন তার বিশেষ কোচিং। সোজা বাংলায়, বাতলে দেন কম পরিশ্রমে কী করে পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভালো রেজাল্ট লাভ করা চলে, সুনির্দিষ্ট কোন্ ধরনের প্রশ্নে তার পরীক্ষা নামক সমস্যার ত্বরিৎ মীমাংসা সম্ভব। এ ধরনের সাহায্য লাভের জন্য ছাত্র আদৌ কুন্ঠিত নয়, কেননা সে জানে তার অভিভাবকের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক এ কাজ করছেন। অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে যখন মালিক চাকুরের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই পরিবেশে কী করে সম্ভব শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে গুরু শিষ্যের অনাবিল সম্পর্ক স্থাপনের? পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে, মূল সমস্যার সুরাহা না করে, বাহ্যিক ও লৌকিক সংকট প্রতিকারের ব্যবস্থা কেবল উদ্দেশ্যহীন ও ব্যর্থই হবে না, করুণও হাস্যকর ও হবে। অতি সাম্প্রতিককালের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির কারণঃ প্রথমতঃ ছাত্রের উপর শিক্ষা বহির্ভূত দুষ্ট চক্রের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষানুরাগী আদর্শ তৃপ্ত শিক্ষকের অভাব। এর ও কারণ এতোক্ষণের আলোচনায় কয়েক দফা বের করার প্রচেষ্টা হয়েছে। মনে হয় এ দুটি প্রভাব কাটিয়ে ওঠা এবং বিশেষভাবে শিক্ষকের সম্মান সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপই হবে এই আত্মঘাতী সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধানের যথার্থ প্রয়াস।

বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষানুরাগী শিক্ষাবিদের অংশ গ্রহণের আয়োজন আশু প্রয়োজন। শুধু শিখন্ডীর মতন বসিয়ে রাখলে চলবে না, তাঁকে কার্যকরী ভূমিকায় যথার্থ ক্ষমতা দিতে হবে, দিতে হবে যথাযোগ্য মর্যাদা, সেই সঙ্গে আবশ্যিক ভিত্তিতে দিতে হবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। নইলে বোধগম্য কারণেই সমগ্র প্ল্যান—পরিকল্পনা থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড় এ পর্যবসিত হবার আশংকা।

বেসরকারী কলেজ পরিচালনা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কমিটির গঠন এমনি হওয়া উচিত যাতে শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর সার্থক সমন্বয় ঘটে। শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থেই এমন পদক্ষেপ নেয়া কর্তব্য। অর্থাৎ স্বার্থান্বেষী মহল যেন কোন প্রকারেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কন্ঠ রোধ করতে না পারেন, সে সতর্কতা আশু প্রয়োজন। রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের পক্ষে ইচ্ছা সত্বেও প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যাপারে সহযোগিতা সম্ভব হয় না, তাঁদের পেশাগত ব্যস্ততার জন্য। ফলে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব হয়। দীর্ঘায়িত সমস্যা, বিলম্বিত বিড়ম্বনা পরিবেশের অসহায়তাই বৃদ্ধি করে মাত্র। শিক্ষানুরাগী ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী ও বলিষ্ঠ চেতনার শিক্ষাংগণে আজ বড় প্রয়োজন।

www.pathagar.com

উপসংহারঃ প্রকৃত বিচারে শিক্ষার পরিবেশে সুস্থ আবহাওয়া বিরাজমান থাকুক, এ সকলের কাম্য। তার জন্য প্রয়োজন, শিক্ষার উপর সর্বাত্মক ভাবে গুরুত্ব আরোপ। শিক্ষার প্রাধান্য প্রাপ্তির অর্থই হবে শিক্ষাক্ষেত্রে যাবতীয় বৈষম্য ও অনাচারের সার্থক অবসান। কেন না যে মুহূর্তে শিক্ষা প্রায়রিটি পাবে, সে মুহূর্তে শিক্ষার মানের অবনতি, পরিবেশের বিশৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ বিশ্লেষিত হবে এবং তা প্রতিকারের কার্যকরী পদ্ধতি গৃহীত হবে। আমাদের অনুন্নত এ দেশটিতে সমস্যার অভাব নেই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ, ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করছে মানুষ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য অজ্ঞানতা এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাধি। এর অবসানে আনুষংগিক হিসাবে বাকী সমস্যাসমূহেরও সিসটেমেটিক সমাধান আশা করা যায়। তাই অশিক্ষার বিরুদ্ধে আজ যেমন বাস্তবমুখী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, তেমনি প্রতিকারের বিধান করতে হবে বর্তমানের শিক্ষার নামে প্রচলিত অশিক্ষার। অতীতের উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি চক্র তৈরী হচ্ছে মাত্র—জন্ম নিচ্ছে একটি উন্নাসিক শ্রেণী। তেলা মাথায় তেল প্রদানের মত তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে আমাদের জিইয়ে রাখা অব্যবস্থা ও নিত্যনবহারে সৃষ্টি করা বিশৃংখলা।

আমরা জানি, শিক্ষিত নাগরিকের কাছেই দায়িত্ব সচেতনতা আশা করা সম্ভব। সার্থক শিক্ষার আলোই পারে শান্তির প্রতিফলন ঘটাতে সমাজের সর্বস্তরে—সে আলো কাজে আসবে সকল ধরনের সমস্যারূপ অন্ধকার দূরীকরণ প্রকল্পে। এই যে জনসংখ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণ সর্বগ্রাসীর মতো সর্বনাশা থাবা বিস্তার করে চলেছে অতি দ্রুত তারও সমাধান সম্ভব একমাত্র ফলপ্রসূ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে। লক্ষণীয়, শিক্ষিত জনসাধারণের জনসংখ্যা সীমিত। সংস্কার কাটিয়ে যুক্তির আসন প্রতিষ্ঠা করা চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই।

তাই আর কালক্ষেপ নয়—নয় জল্পনা কল্পনা, শিক্ষা, একমাত্র শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আজ সচেতন হতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোন স্বার্থ ত্যাগের জন্য। শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজন শিক্ষার পরিবেশে প্রাণ প্রদান, আর পরিবেশ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দমুখর করার জন্য প্রয়োজন সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। সমস্ত শরীর যদি রক্তহীন থাকে তবে শত চেষ্টা করলেও তার চেহারায় যে সজীবতা আসেনা, এ জানা কথা—ঠিক তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় যদি গলদ থাকে, তবে কেবল পরিবেশ প্রচুর প্রচেষ্টায়ও পূর্ণতা আসবে না, আসতে পারে না।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ

ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সফল শিক্ষা যে অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, এ ধারণা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। অধ্যয়নকে তুলনা করা হয়েছে তপস্যার সাথে। সুতরাং তপস্যার উপযুক্ত পরিবেশ যেখানে সেই আশ্রমে বা তপোবনেই আমরা বিদ্যাচর্চার প্রাথমিক উদ্যোগ লক্ষ্য করি। খৃষ্টান ইউরোপে চার্চের ব্যবস্থাপনায় নগর কোলাহল থেকে দূরে এবং প্রায়ই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মঠে বা তার ধারে কাছে মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পত্তন। মনাষ্টারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—এই কথাটা মনে রাখলে ইউরোপের আদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য-গুলি বুঝতে সুবিধা হয়। একালে এই উপমহাদেশে তিনজন মনীষী শিক্ষা বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন—স্যার সৈয়দ আহমদ, রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন তাঁদের চিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের প্রয়াস করে গেছেন এবং তাঁদের আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছেন প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে। প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ হলেও আমরা যে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হলে আলাদা একটা ক্যাম্পাসের কথা ভাবি, সেও এই কারণেই।

এত কিছু সত্ত্বেও প্রায়ই শিক্ষাঙ্গণের শান্তি বিপন্ন হয়, কখনো কখনো একেবারেই পালিয়ে যায়। দেশে বা সমাজে যখন শান্তি বিপর্যস্ত হয়, শিক্ষাঙ্গণেও তার ঢেউ এসে লাগে। জাতীয় জীবনে যখন তোলপাড় চলতে থাকে, তখন কোন বিদ্যাংগনই তার অভিঘাত এড়াতে পারে না। অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক সময়েও, যখন আপাতদৃষ্টে সমাজে কোন অস্থি-রতা নেই, তখনও গোপন ও অন্তঃশীল উদ্বেগ ও অতৃপ্তির লক্ষণগুলি এখানেই প্রথম ধরা দেয়, বিশেষতঃ সেই সব দেশে যারা রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বৎসরগুলিতে কায়রো থেকে কলকাতায় যে ছাত্র আন্দোলন, তা বৃহত্তর সামাজিক বিক্ষোভেরই অংশ। স্বাধীনতা

www.pathagar.com

অর্জনের পর এইসব এশীয় ও আফ্রিকী দেশের কোন কোনটিতে শিক্ষাঙ্গণে সুস্থিরতা ফিরে এসেছে, তবে সবদেশে নয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে, বিশেষতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে পৌনপুনিক অশান্তি এবং দ্রোহিতা, তারও প্রধান কারণ রাজনৈতিক। জাতীয় আকাংখার সাথে বাস্তব পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান হয়নি। এজন্য যে কোন স্থানীয় ও নিছক শিক্ষানৈতিক সমস্যাই রাজনৈতিক রূপ নিত, কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-সমাজ বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় দেখা দিত, পুলিশের হস্তক্ষেপ ঘটলে সেটা কেউ সহজভাবে গ্রহণ করত না, এবং সামান্য ঘটনাও দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত 'জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট' (১) ১৯৬৬ সনের 'ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র-কল্যাণ কমিশনের রিপোর্ট' (২) যা হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বলেই অধিক পরিচিত, এবং ১৯৬৯ সনের 'নতুন শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব' (৩) এক বিগত যুগের ও অবাঞ্ছিত শাসনের স্মারক হলেও, বর্তমান প্রসঙ্গেও জরুরী ও শিক্ষাপ্রদ।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশ থেকে ঔপনিবেশিক শাসন বিদায় হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বৎসরগুলিতে এদেশে শিক্ষা সম্পর্কিত যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটি পূর্বেও ছিল, আবার কোন কোন সমস্যার সাথে নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমনভাবে জড়িত যে এগুলির পর্যালোচনায় হামুদুর রহমান কমিশনের স্বচ্ছ ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণও তেমন কাজে লাগে না।

শিক্ষাংগণে স্বাধীনতার আগের ও পরের পরিস্থিতির মধ্যে যে সাদৃশ্য ও নতুনত্ব, তা সংক্ষেপে এইভাবে ব্যক্ত করা যায়ঃ—

(ক) যে কোন ছাত্র সমস্যা ও তজ্জনিত ছাত্র-আন্দোলন এখন আর রাজনৈতিক প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে ফেলা সম্ভব নয়। ছাত্র সমাজের সাথে শাসকগোষ্ঠীর যে মৌল অসদ্ভাব ছিল, সে ক্ষেত্রেও সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বর্তমানে সমস্যার সমাধানে সহায়ক।

(খ) স্বাধীনতা পূর্বকালের শিক্ষাগত সমস্যাবলীর কোন সমাধান

1. Report of the Commission on National Education, 1959.
2. Report of the Commission on Student Problems and Welfare, 1966.
3. Proposals for a New Educational Policy, 1969.

www.pathagar.com

হয়নি। মানগত ও পরিবেশগত সমস্যা বরং আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

(গ) দেশের অর্থনৈতিক সংকট শিক্ষাঙ্গণে দারুণ নৈরাশ্য ও তিক্ততার সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) দৃঢ় ও সুচিন্তিত শিক্ষানীতির অবর্তমানে পরিবেশের মধ্যে অভূতপূর্ব নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে।

এখানেই একটা কথা পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার। শিক্ষার প্রসংগকে কখনোই জাতীয় ও সামাজিক প্রসংগ থেকে এবং বিশেষভাবে পরিবেশের প্রশ্নকেও তেমনি বৃহত্তর প্রশ্নগুলি থেকে, বিশেষতঃ শিক্ষার মানের প্রাসংগিক প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ বিচ্ছিন্ন প্রসংগত' নয়ই, বরং ওতোপ্রোতভাবে পরস্পর বিজড়িত। তেমনি, শিক্ষাগত কোন পরিকল্পনাই জাতীয় পরিকল্পনা থেকে আলাদা নয়। যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এটা একটা সহজ সত্য যে শিক্ষাংগণে বর্তমানে যে অব্যবস্থা তা সরাসরি জাতীয় জীবনে যে সার্বিক, পরিস্থিতি তারই প্রতিফলন। জাতীয় জীবনে সুস্থিরতা, কর্মপ্রবণতা, ও শৃংখলা ফিরে এলে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার সুফল ফলবে শিক্ষাঙ্গণেও তার ব্যতিক্রম নয়।

গত ত্রিরিশ বৎসরের মধ্যে দুটি রাজনৈতিক ওলটপালট আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক ধারাবাহিকতার উপর এক মারাত্মক আঘাত।

রাষ্ট্রনৈতিক বিল্পব পরিণামে সুফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপাততঃ নানা সমস্যার জন্ম দেয়। সাতচল্লিশের ও একাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার জন্য দায়ী। তবে সমস্যাগুলি একটু ভিন্ন ধরনের। সাতচল্লিশের পর শিক্ষাঙ্গণে কোন বিশৃংখলা ছিল না। অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকদলের দেশ ত্যাগে শিক্ষায় মানের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে কোন মারাত্মক অব্যবস্থা দেখা দেয়নি। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হলে দেশের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে তার আঘাত-চিহ্ন দেখা গেল। সাতচল্লিশ বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্য অনেক সম্ভাবনার খবর এনেছিল, দেশের সর্বসাধারণের জন্য নয়। একাত্তরের হাওয়া পল্লীর সামান্যতম কুড়েঘরকেও স্পর্শ করেছিল। তাই তার পরিণতি—স্বাধীনতা—দেশের সর্বসাধারণের জন্য অত্যুচ্চ আশার পথ খুলে দেয়। বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিপর্যস্ত প্রশাসন ও অব্যব-

www.pathagar.com

স্থিত নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয়নি সেই সীমাহীন প্রত্যাশার মোকাবিলা করা। শিক্ষাঙ্গণে যে হিংসা ও হানাহানি দেখা গেল তা শুধুই রাজনৈতিক কারণেই নয়, তার জন্য পটভূমি তৈরী করেছিল এক নতুন পরিস্থিতি, সীমিত সুযোগ-সুবিধার উপর হঠাৎ ছাত্র-জনতার চাপ। যে কোন দেশেই যে কোন সমাজেই এই চাপের ফলে শিক্ষা পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। বাংলাদেশেও হতে বসেছিল।

পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার জন্য যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি দায়ী, তার অবসান হলেও অন্যান্য কারণগুলি এখনও বর্তমান। অবশ্য আরও একটা শুভ পরিবর্তন ঘটেছে—মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনেকটা স্থিতি ও স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। এবং এর ফলে ইতিমধ্যেই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাপ এখন কিছুটা মন্দীভূত। মন্দীভূত হলেও সুনিয়ন্ত্রিত নয় ও সুসমঞ্জস নয়। ইত্যবসরে একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক বৎসরের বিশৃংখলার মধ্যে যেসব নতুন কলেজের পত্তন হয়েছিল, তারা এখন আর রসদ পাচ্ছে না। যেখানে একটি কলেজ ভালোভাবে চলতে পারত, সেখানে চার-পাঁচটি কলেজ খুঁড়িয়ে চলছে। শিক্ষার গোলমেলে পরিবেশে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এই রুগ্ন ও দুর্বল কলেজগুলির জন্য।

উচ্চতর শিক্ষার মূল সমস্যা খুঁজে পেতে হলে সেটা পাওয়া যাবে আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনায় বিভ্রান্তির মধ্যেই। এই বিভ্রান্তিই জন্ম দিয়েছে অনেক ভুল সিদ্ধান্তের অনেক ভুল কার্যক্রমের। মানগত ও পরিবেশগত সমস্যা এই মূল বিভ্রান্তিরই দুইদিক।

বিভ্রান্তিটি আমাদের উচ্চ শিক্ষায় প্রথম ডিগ্রীর লক্ষ্য ও ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে প্রথম ডিগ্রীর (পাস বা অনার্স) মেয়াদ ছিল দু'বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজসমূহে এই স্তরের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চতর পর্যায়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র ছিল স্পষ্ট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক ও এক বৎসরের স্নাতকোত্তর কার্যক্রম তার সীমিত এলাকার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে থেকে পাস কোর্সে ডিগ্রী নিয়ে আসা ছাত্রদের জন্য একটা পার্শ্ব ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল, কিন্তু মূল (৩+১=৪ বৎসর) ব্যবস্থায় সেটা কোন চাপ সৃষ্টি করেনি।

www.pathagar.com

অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী অতিরিক্ত ভূমিকা ও সেই সাথে তার ক্রমবর্দ্ধমান নিজস্ব শিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে মারাত্মক অসংগতি দেখা দিল।

এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার দু'টি সম্ভাব্য পথ খোলা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, যার একটিও নেওয়া হয়নিঃ—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সীমিত রেখে রাজধানীর একাধিক কলেজে প্রথম ডিগ্রী শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত ও সমন্বিত করা। এবং

(খ) স্নাতক অংশকে অল্প সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে সীমিত রেখে রাজধানীর ও দেশের কিছু সংখ্যক কলেজে অনার্স পর্যায়ে ডিগ্রী শিক্ষা শক্তিশালী করা।

যে কোন কারণেই হোক, বাংলাদেশে অনার্স ডিগ্রীর কৌলীন্য উচ্চ শিক্ষায় শুধু মানগত নয়, পরিবেশগত বিপর্যয়েরও কারণ হয়েছে। অনার্স ডিগ্রীর এই তথাকথিত জনপ্রিয়তা ও তার প্রতি কোন অতিরিক্ত মোহ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেই। এই মোহের ফলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে মংগলের চেয়ে অমংগল হয়েছে অনেক বেশী। এটা আর কোন নতুন খবর নয় যে বর্তমানে যারা অনার্স ডিগ্রীর জন্য পড়াশুনা করছে তাদের একটা বড়ো অংশ পাশ কোর্সের একেবারেই অযোগ্য। এবং এই ছাত্রেরাই সংখ্যায় বেশী হওয়ায় অনার্স ডিগ্রীর কৌলীন্য এখন শুধু নামেই, বাস্তবে নয়। কিন্তু তাতেও আপত্তি ছিলনা যদি না এই অনার্স ডিগ্রী শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধঃপতনের জন্য ও সেই সঙ্গে দেশের সম্পূর্ণ কলেজ ভিত্তিক শিক্ষার অবনতির জন্য সরাসরি দায়ী হতো। অনার্স ডিগ্রীর মোহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত পরিসরে যে অতিরিক্ত ছাত্রের ভীড়, তার ফলে শুধু ডিগ্রীর 'মান'ই নিম্নগামী, তা নয়; পরিবেশও অস্থির ও আন্দোলিত।

অনার্স শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এ পর্যন্ত যে সরকারী চেষ্টা তার সার্থকতা এখনও যাচাই করে দেখা হয়নি। এ সম্বন্ধে একটা আলাদা সমীক্ষা হওয়া দরকার। শিক্ষা সার্ভিসের ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তান আমলের একটা মারাত্মক ত্রুটির কথা—যা এ যাবৎ সংশোধিত হয়নি—এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। শিক্ষা সার্ভিসের উচ্চতম পদগুলি সবই প্রশাসনিক এবং অধ্যাপকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রকৃত অধ্যাপনার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই উদ্ভট পরিস্থিতি আর কোন সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে আছে বলে আমার জানা নেই। সরকারী

www.pathagar.com

কলেজগুলিতে অনার্স ডিগ্রী শিক্ষা প্রবর্তনের সাধু সংকল্প নষ্ট হয়েছে অনেকটা এই কারণেই।

(ক) অনার্স ডিগ্রীর এই কৌলীন্য, তার কোন ভিত্তি থাক বা না থাক-যতোদিন আছে, ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যতোদিন স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রথম ডিগ্রীকেই প্রধান সম্বল করে চলছে, ততোদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছাত্রদের চাপের এটাই প্রথম ও প্রধান কারণ থেকে যাবে।

(খ) এই অবাস্তব ও অযৌক্তিক চাপের জন্য শুধু ছাত্ররাই দায়ী নয়, শিক্ষকেরাও বিশেষতঃ বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষও সমপরিমাণে দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এযাবৎ কোথাও আলোচিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি; সে হল একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে মানগত ও নীতিগত সামঞ্জস্যহীনতা। বিভাগীয় ব্যবস্থা এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ নিয়ে দুর্বল বিভাগগুলি প্রায়ই নিম্নমানের ছাত্রদের নিয়ে বিভাগ পূর্ণ করে। ভর্তির মওসুমে, সদর দরোজার ভর্তি বন্ধ হয়ে গেলে এই সব বিভাগ খিড়কীর দরোজা খুলে রাখে ঐসব ছাত্রকে ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য যারা উপযুক্ত সময়ে কর্তৃপক্ষের মাথার উপর লাঠি ঘোরায়।

(গ) ছাত্র চাপের তৃতীয় কারণটা সহজে নজরে পড়ে না, কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণে এটাই সম্ভবতঃ মূল কারণ—জাতীয় ভর্তি নীতির অভাব। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কোন পরিস্কার নীতি নেই—কেবলমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও গুটি কয় বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে। যে কোন পর্যায়ের শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা ও ভর্তির সম্ভাব্যতার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু এ দেশে সাধারণ ডিগ্রী কলেজ ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিলে) এর ব্যতিক্রম। এই অন্যায় ও অসংগত পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছে জাতীয় পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা-পরিকল্পনার কোন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ার কারণে। জাতীয় জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ স্তরের শিক্ষিতের কতো সংখ্যার প্রয়োজন, এবং বর্তমানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের ক্ষমতার গন্ডীর মধ্যে সেই চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে—আমাদের উচ্চ শিক্ষায় যতোদিন এই প্রয়োজনীয় ভাবনা কার্যকর না হচ্ছে, ততোদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছাত্রের চাপ কমবে না।

জনশক্তি জরীপ কথাটা যে একেবারেই শোনা যায়নি, তা নয়। কিন্তু শিক্ষানীতি, বিশেষতঃ ভর্তি বিষয়ক নীতির সাথে এসব জরীপের কোন সমন্বয় এ পর্যন্ত ঘটেনি।

www.pathagar.com

সমস্যার আরও গভীরে গেলে প্রশ্নটি শুধু জাতীয় ভর্তি নীতির মধ্যেই নিহিত নয়, সার্বিক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ইশারা করে। স্কুলের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্র সমাজের যে অংশ উচ্চতর শিক্ষার অনুপযোগী তাদের জন্য বিকল্প পথ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান হলে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অপ্রয়োজনীয় ভীড় দেখা যেত না। কিন্তু আমরা শুধু সমস্যাটির উল্লেখ করতে পারি, এর সমাধান শুধু যে শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তাদের হাতে নেই, তা নয়, আপাততঃ কারও হাতেই নেই। জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি এই প্রবাহ বন্ধ করার একটা উপায় বের হয়, এবং তার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, জাতীয় পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা পরিকল্পনা সমন্বিত হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি চাপ ও তজ্জনিত পরিবেশের অবনতি রোধ করা সম্ভব।

উচ্চ শিক্ষারক্ষেত্রে ছাত্র সাধারণের অনিচ্ছা বা অক্ষমতার প্রসংগ সে জন্যই বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকটা অবান্তর। কোন দেশেই সব ছাত্র উচ্চতর শিক্ষার যোগ্যতা রাখে না। যারা অযোগ্য তাদেরকে জায়গা দেয়ার পর যে বিড়ম্বনা অবধারিত। সেজন্য তারা দায়ী নয়। কিন্তু একজন উপযুক্ত ছাত্রের সাথে দুই বা তিনজন দুর্বল ছাত্রকে ভর্তি করার অর্থ শুধু দুর্বল ছাত্রের (ও তার শিক্ষকের) বিড়ম্বনা নয়। উপযুক্ত ছাত্রটিকেও তার প্রাপ্য সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। এই দায়িত্বহীনতার জন্য প্রধানতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী।

একজন (গড়পড়তা) ছাত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার সম্পর্ক অনেকটা এ রকম; আবাসিক ছাত্র হিসেবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উপরন্ত ভর্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে, সে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই কিম্বা আরও আগে থেকে তার বিড়ম্বনার শুরু। আবাসিক ছাত্র হলেও তার থাকার জায়গা নেই—কবে হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। সে এক অবাঞ্ছিত অতিথি, কোথায়ও কোন ক্রমে মাথা গোজার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। দেরীতে হলেও একদিন পড়াশুনা শুরু হল, কিন্তু তখনও তার মাথায় একটিমাত্র চিন্তা, একটিমাত্র উদ্বেগ, কোথায় থাকবে, কি খাবে। সে যদি কোন মেধা বৃত্তি পেয়েও থাকে, বৃত্তির টাকা হাতে আসতে তার বছর ঘুরে যাবে। বৃত্তি সে পাবে, তবে কখন পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। ওই বৃত্তির টাকা যদিও তার মোট ব্যয়ের অংশমাত্র, তবু সেই অংশটুকুর জন্যও সে বৃত্তির উপর নির্ভর করতে পারবে না। সে মনোযোগী ছাত্র, কিন্তু প্রায়ই নানা কারণে তার পড়াশুনা বিঘ্নিত হবে। সে কোন ধর্মঘটে যেতে চায় না, তবু সহপাঠীদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে তাকে ক্লাশ থেকে দূরে থাকতে হবে। সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অপ্রস্তুত অংশের জন্য তাকেও অপেক্ষা করতে হবে। সে দরিদ্র পরিবারের সন্তান, অতিরিক্ত দু'মাসও তার ও তার পরি-

www.pathagar.com

বারের জন্য পীড়াদায়ক, কিন্তু দু'মাস কেন অতিরিক্ত দু'বছরও তাকে অন্যের অপরাধে দন্ডভোগ করতে হবে। তার এ সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপারগ। সে আসতে পারে, কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারে না ইচ্ছা মতো, বা সময় মতো তার ব্যক্তিগত সমস্যা শোনার জন্য হয়তো একজন উপদেষ্টা আছেন, কিন্তু কে জানে তার কাছে গেলে তিনি যদি বিরক্ত হন। এসব ছাত্র মহলে জানা থাকায় ছাত্রটি হয়তো তার কাছেই যাবে না। ইতিমধ্যে অস্থানে-কুস্থানে এবং হলের খাবার খেয়ে সে হয়তো আমাশয় বাধিয়ে বসেছে। ক্লাশের বক্তৃতা মামুলী, একঘেয়ে, অনিয়মিত। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই মেলে না, ল্যাবরেটরীতে আজ এটা নেই, কাল ওটা নেই। সে কাজ করতে চায়, কিন্তু তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন এমন শিক্ষক পায় না। সে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল, আকন্ঠ বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি নিয়ে তার ছাত্র জীবন শেষ করে।

একজন শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর সম্পর্কটা কেমন? তিনি যদি অত্যন্ত কৃতী ছাত্র হয়ে থাকেন, তবে চাকুরীতে ঢোকার অল্প কয় বৎসরের মধ্যে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। বিদেশের ক'বছর তাঁর ভালো কাটবে, তিনি গবেষণায় সফল হবেন। ফিরে এসে কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মোহভংগ হবে। শিক্ষার গতানুগতিকতা, গবেষণার অসুবিধা এবং শেষ পর্যন্ত পরিবেশের মধ্যকার জড়তা সংক্রমিত হবে তাঁর চিন্তায় ও কাজে। তাঁর পদোন্নতি আটকাবে না। কারণ পদোন্নতির শর্তাবলী অনেক দিন যাবৎ শিক্ষক-স্বার্থের অনুকূলে শিথিল করা হয়েছে।

যিনি অতোটা কৃতী ছাত্র নন, তাঁর অভিজ্ঞতা একটু অন্য ধরনের হবে। শিক্ষকের জীবনে পদোন্নতির দুরূহতা তাঁর মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করবে। জ্যেষ্ঠ সহযোগীদের সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রায় অনিবার্য নিয়মেই বিরূপতার সৃষ্টি হবে, তাঁর দৃষ্টি ভংগীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা বক্রতা এসে যাবে। কর্তৃপক্ষ মাত্রই তাঁর কাছে মনে হবে বিস্বাদ ও বিরক্তিকর। ছাত্র জীবনের অধীত বিদ্যা তিনি একদিন ভুলে যাবেন। নতুন জ্ঞানের সাথে তাঁর কোন দিন সাক্ষাৎ ঘটবে না, তিনি নতুন কোন বই পড়বেন না, কোন দিন লাইব্রেরীতে যাবেন না, ছাত্রদের উত্তরোত্তর অবনতি তাঁর আলোচনার বাঁধা গৎ হবে--তিনি একদিন এক বিবর্ণ বিরক্ত নেতিবাচক মেজাজের অতলে তলিয়ে যাবেন।

এই দুটি বর্ণনার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের (বা কলেজের) সমস্ত শিক্ষক ধরা দেবেন না, এ বিষয়ে আমি সচেতন। অনেক ব্যতিক্রম আছে, অনেক প্রকার ভেদ, অনেক ব্যক্তি যাঁরা কোন ছকে ধরা দেন না। তবু শিক্ষক সম্প্র-

www.pathagar.com

দায়ের একটা বড়ো অংশ, সামান্য হেরফের সমেত, এই বর্ণনার বৃত্তে অবশ্যই পড়ে যাবেন।

এদেশে শিক্ষার মান কখনোই উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচু ছিল না, তাই তার নিম্নগতি সম্বন্ধেও আলোচনা কিছুটা অনুমান নির্ভর। তবে শিক্ষার পরিবেশে যে অবনতি ঘটেছে, সেটা মোটেও অনুমানের বিষয় নয়, নির্জলা সত্য। হামেশা ধর্মঘট, বিভিন্ন ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ, এমনকি হত্যাকান্ড, ছাত্রের হাতে শিক্ষকের অপমান, ঘেরাও, পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আন্দোলন, আইন-শৃংখলার প্রতি অবজ্ঞা—এ সমস্তই পরিবেশগত রুগ্নতার লক্ষণ। প্রকটভাবে এগুলি দৃষ্টিগোচর যখন হয়নি, তখনও অর্থাৎ বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বেও অসুস্থতার বা অস্বাস্থ্যের সর্ব লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। 'বিদ্বজ্জনের প্রতিষ্ঠান' বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মৌল পরিচয় অনেক দিন ধরেই অস্পষ্ট। শিক্ষক সমাজের সামগ্রিক জড়তা ও নিষ্ফলতাই বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক দিক। পরিবেশ সৃষ্টির কাজে ছাত্রের দায়িত্ব যতোখানি, শিক্ষকের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী. কারণ শিক্ষক তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সদস্য, ছাত্র একজন অস্থায়ী (বা মেয়াদী) মেহমান মাত্র।

শিক্ষকেরা শ্রেণী হিসেবে সৃষ্টিধর্মী হতে পারছেন না কেন, সেটাও এক আলাদা সমীক্ষার বিষয় হতে পারে। ছাত্র অসন্তোষ যেমন জন্ম দিয়েছিল হামুদুর রহমান কমিশনের, তেমনি শিক্ষক সমাজের অসন্তোষ ও দাবী-দাওয়ার ফলে এসেছিল নূর খানের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব। এক নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বিধির খসড়া তৈরী হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে পরবর্তীকালে যে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি জাতীয় সংসদ দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনও ঘটেনি। জাতীয় জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়েও হবে না এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে গণতন্ত্রের বিকৃতি ঘটলে তার অশুভ প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটবে—এটাই আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা।

আপাততঃ পরিস্থিতি এই যে পরিবেশ গঠনে ও পরিবেশের উন্নতি সাধনে যাঁদের ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো, সেই শিক্ষক সমাজ --নিরুৎসাহও নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে আছে। কারণ পরিবেশের দৈন্য যেমন ছাত্রের জীবনে ব্যর্থতা ও তিক্ততা সৃষ্টি করে, তেমনি বা তার চেয়েও বেশী করে শিক্ষকের জীবনে। ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান সমগ্র শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব, গুটিকয় বিশেষজ্ঞের নয়। কিন্তু নির্দেশনা ও পরামর্শ ছাত্র সমাজ বাইরের রাজনৈতিক অভিভাবকদের কাছ থেকে এত প্রচুর পরিমাণে পেয়েছে, যে শিক্ষকের কোন প্রয়োজন আর থাকেনি।

পরিবেশগত সমস্যার কয়েকটি মাত্র উপরে আলোচিত হয়েছে। সমস্যা

www.pathagar.com

চিহ্নিতকরণের মধ্যেই সমাধানের ইংগিত পাওয়া যাবে। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখা যেতে পারে—

(ক) শিক্ষা সর্বস্তরেই পরিকল্পিত হতে হবে, এবং নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকার থাকবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা—কমিশনের রিপোর্টে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি (রিপোর্ট, ৩৪, ৩০, পৃঃ ২৭৬/৭৭)।

(খ) প্রথম ডিগ্রী (বি. এ.—বি. এস-সি. ইত্যাদি) সম্বন্ধে নতুন চিন্তার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা ও প্রয়োজন মতো সীমিত হারে স্নাতক শিক্ষার কেন্দ্র হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন ও কার্যক্রম সংকোচনের সাথে সাথে কলেজগুলির মানোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য পারিবারিক আয় ও মেধার ভিত্তিতে জাতীয় বৃত্তি প্রকল্প প্রচলন করা উচিত।

(ঘ) উচ্চতম মানের উচ্চশিক্ষা জাতীয় নীতি হিসেবে গৃহীত হলে বেতন স্কেলে তার প্রতিফলন হতে হবে।

(ঙ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রধান শিক্ষকদের এই সত্যের সাংগঠনিক স্বীকৃতি হিসেবে একটি উচ্চমানের ও উচ্চবেতনের ক্যাডর তৈরী করা উচিত। এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পাশাপাশি জাতীয় হেডমাষ্টার পরিষদ গঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় তাঁদের মতামত গুরুত্বের সাথে গৃহীত হবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধিত্ব সমেত নির্বাচনী বোর্ড গঠন।

(ছ) শিক্ষায়, খেলাধুলায় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছাত্রদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন।

www.pathagar.com

আলোচনা

চতুর্থ অধিবেশনঃ সময় ৫ই এপ্রিল '৭৬ বিকাল ৪টা ৩০মিঃ থেকে ৬টা

বিষয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার পরিবেশ।

সভাপতিঃ ডঃ আবদুল করিম, ভাইস-চ্যান্সেলার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এই অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং কলেজ শিক্ষার পরিবেশ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকার শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মিসেস হোসনে আরা শাহেদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নুরুর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব স্বপন আদনান, দিনাজপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আলী আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ জিল্লুর রহমান।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে **ডঃ নুরুর রহমান খান** বলেন, শিক্ষাঙ্গণকে যেকোন মূল্যে রাজনীতির আওতামুক্ত রাখতে হবে, তা না হলে শিক্ষাংগণের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করা যাবে না। ছাত্র সমাজকে রাজনীতিবিদগণ নিজেদের হাতিয়ারতুপে ব্যবহার না করে শিক্ষকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে যে অবনতি ঘটেছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, একজন প্রকৃত শিক্ষক সকল অবস্হাতেই ছাত্রদের শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদিগকে গুণ ও জ্ঞান অর্জন করে আদর্শ শিক্ষকরুপে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। জোর করে কারো কাছ থেকে সম্মান আদায় করা যায় না। সম্মান পাওয়ার জন্য জ্ঞানী হতে হবে, আদর্শ শিক্ষকসুলভ গুণাবলী তাঁদের মধ্যে থাকতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের সংগে ছাত্রদের সম্পর্ক কখনও খারাপ হয় না, তিনি যতই কঠোর ব্যবহার করুন না কেন ছাত্রগণ উপলব্ধি করে তিনি তাদের মংগলের জন্যই

www.pathagar.com

করছেন, ছাত্রগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তিনি শিক্ষকদিগকে প্রকৃত শিক্ষকের গুণাবলী অর্জনের পরামর্শ দেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা খাতের সরকারী ব্যয়ের সিংহভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। এরূপ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে কলেজসমূহের জন্য পৃথক মঞ্জুরী কমিশনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মান শুধুমাত্র সুযোগ-সুবিধার উপরই নির্ভর করে না। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের নিম্ন হার শিক্ষার নিম্ন মানের জন্য দায়ী। ছাত্রদের জন্য যুগোপযুগী ও প্রয়োজনীয় পাঠক্রম, আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম, নূতন ভাবধারায় লিখিত পুস্তকাবলী, আধুনিক গ্রন্থাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য ছাত্রদের টিউটরিয়াল ক্লাশ নেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকদের সম্পর্কেও বলার অনেক কথা আছে। বর্তমানে শিক্ষকতার পেশায় যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁদের অনেকেই শিক্ষক হওয়ার উপযোগী নন। অন্য কোথাও চাকুরী পাচ্ছেন না বলেই এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। মনে প্রাণে তাঁরা এই পেশাকে গ্রহণ করেননি। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রদের যেমন রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষকদিগকেও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। তাঁরা যদি কৃতী শিক্ষক হন তাহলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই তাঁদেরকে সম্মান করবে। প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরকে এই পেশার দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। কেননা কেবল মাত্র ভাল শিক্ষক নিয়োগ করা হলেই আমরা ভাল শিক্ষা পেতে পারি। শিক্ষকদের জন্য যথাযোগ্য বেতন, আবাসিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে প্রতিভাবান লোকদিগকে এই পেশায় দিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

ডঃ আলী আহমেদ শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন, শিক্ষার মান ও পরিবেশ কোন আলাদা জিনিষ নয়। সরকারী কলেজগুলোতে নানারূপ সমস্যা রয়েছে। এই কলেজগুলোর জন্য শিক্ষা-সম্পর্কিত আধিকর্তা একজন আর প্রশাসনিক অধিকর্তা অন্যজন। অনেক বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণের ফলে যাঁরা ভাল শিক্ষক নন তাঁরাও শিক্ষা সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন অথচ তাঁদের জন্য কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এরফলে অনেক নীচু মানের শিক্ষক-

www.pathagar.com

দেরকেও এখন কলেজের শিক্ষকতার ক্যাডারে দেখতে পাওয়া যায়। প্রশাসনিক খামখেয়ালীর জন্য অস্থায়ী শিক্ষকগণ সারা জীবনই অস্থায়ী শিক্ষকরূপে থেকে যান। তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান করা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষকতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়েও অনেকে কলেজের শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত আছেন। কলেজ শিক্ষকদিগকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী কলেজগুলোতে প্রফেসারের পদ অত্যন্ত সীমিত। এই কারণে পদের অভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষকতার কাজে রাখা হয় না। তাঁদেরকে পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসনিক পদে নিয়ে বসানো হয়। এতে ছাত্রগণ একজন যোগ্য শিক্ষকের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণকে মোটেই কাজে লাগানো হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শুধুমাত্র স্নাতকোত্তর পড়াশুনা এবং গবেষণা কাজের জন্যই উন্মুক্ত রাখা উচিত।

শিক্ষা পরিবেশের অবনতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রদেরকে আমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেই কিভাবে, যদি তারা দেখে পড়াশুনা করার চেয়ে রাজনীতি করা অনেক বেশী লাভজনক তাহলে এই পরামর্শে তারা কান দেবে না। ছাত্রদের চাপের মুখে শিক্ষা কার্যক্রম বাতিল করা, পরীক্ষা পিছানো ইত্যাদি গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোট বইতে বাজার ছেয়ে গেছে। কোন ছাত্র মূল বইয়ের পাতা কোনদিন উল্টিয়ে দেখে না, তারা নোট বইয়ের সাহায্যেই পরীক্ষা পাশের চেষ্টা করে। এরূপ নোট বই ছাপানো আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে। বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে গ্রেস নম্বর দেয়ার পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া উচিত। যারা সত্যি পাশ করার যোগ্য তাদেরকেই শুধু পাশ করানো উচিত। সমস্যা জর্জরিত বেসরকারী কলেজগুলোর সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত কলেজ স্থাপনও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্টের একটি অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের মহকুমাগুলোকে পুনঃনির্ধারণ করে প্রত্যেকটি মহকুমায় একটি করে সরকারী কলেজ স্থাপন করা উচিত।

জনাব স্বপন আদনান পঠিত নিবন্ধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জন্য, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য শিক্ষক ছাত্র উভয় পক্ষই দায়ী। এতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ জিল্লুর রহমান 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রের নৈতিক সংকট' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ আবদুল করিম বলেন, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশীর ভাগ কলেজেই শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না সেই ব্যবস্থায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আশা করা বৃথা। তিনি কতগুলো উদাহরণ দেখান যেখানে শিক্ষকগণ ৬/৭ মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না। এরূপ চরম অর্থ-নৈতিক দুর্দশাগ্রস্থ শিক্ষকদের কাছ থেকে কিভাবে আমরা উন্নত মানের শিক্ষাদান আশা করতে পারি? মফস্বল এলাকার অনেক কলেজ ন্যূনতম শর্ত পূরণ করে না। সেখানে ক্লাশরুম, লাইব্রেরী, শিক্ষার সরঞ্জাম, ব্যব-হারিক পরীক্ষণাগারের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ছাত্রদের আবাসিক সংস্থান ইত্যাদি ছাড়াই ছাত্র ভর্তি করে ক্লাশ শুরু করে দেয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা মোকাবেলা করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ক্লাশরুম ও ছাত্রাবাস সমূহে সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই ধরনের পরিবেশে উন্নতমানের লেখাপড়া আশা করা সম্ভব নয়। শূন্য থেকে ভাল ছাত্র তৈরী করা যায় না। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য। এই কারণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু রাতারাতি ইহা করা সম্ভব নয়, কেননা ইহা একটি বিরাট কাজ। পর্যায়ক্রমিক জাতীয়করণ কর্মসূচী গ্রহণ করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শিক্ষার পরিবেশের যে অবনতি ঘটেছে তাতে শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষক হতে হবে। তাঁদেরকে গবেষণার দিকে মন দিতে হবে। আমাদের যে সীমিত রিসোর্সেস রয়েছে তা নিয়ে রিসার্চের কাজ করে যেতে হবে। অনেক সময় উদ্যোগের অভাবে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় না। শিক্ষকগণ নিজেরা জ্ঞানর্জনে উদ্বুদ্ধ হন না। শিক্ষকেরা নিজেরা জ্ঞানী না হলে ছাত্রদেরকে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

www.pathagar.com

৩

প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশ

- প্যানেল নং ১ ঃ বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, গবেষণা, পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।**
  সভাপতি ঃ **ডঃ মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ,** ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

- প্যানেল নং ২ ঃ **বিষয়** ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি।**
  সভাপতি ঃ **ডঃ এ. এফ. এম. সালাহউদ্দিন,** অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়।

- প্যানেল নং ৩ ঃ বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি।**
  সভাপতি ঃ **ডঃ এ. কে. এম. সিদ্দিক,** অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

- প্যানেল নং ৪ ঃ বিষয় ঃ **কলেজে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্য-পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।**
  সভাপতি ঃ **জনাব তোফাজ্জল হোসেন.** অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ।

- প্যানেল নং ৫ ঃ **বিষয়** ঃ **কলেজে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি।**
  সভাপতি ঃ **জনাব আবু সুফিয়ান,** অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ।

www.pathagar.com

● প্যানেল নং ৬ ঃ বিষয় ঃ **মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।**

সভাপতি ঃ **ডঃ এ. কে. এম. আমিনুল হক,**
অধ্যাপক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ৭ ঃ বিষয় ঃ **মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি।**

সভাপতি ঃ **ডঃ শামসুদ্দিন মিয়া,**
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।

● প্যানেল নং ৮ ঃ বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, আবাসিক সুবিধাদি।**

সভাপতি ঃ **ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর,**
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ৯ ঃ বিষয় ঃ **কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি।**

সভাপতি ঃ **জনাব এম. আই. চৌধুরী,**
অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ১০ ঃ বিষয় ঃ **মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি।**

সভাপতি ঃ **ডঃ ইকবাল মাহমুদ,**
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

● প্যানেল নং ১১ ঃ বিষয় ঃ **শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব।**

সভাপতি ঃ **ডঃ নাজমুল করিম,**
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ১২ ঃ বিষয় ঃ **শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা।**

সভাপতি ঃ **ডঃ কাজী আবদুল মান্নান,**
অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ১৩ ঃ বিষয় ঃ **শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা।**

সভাপতি ঃ **ডঃ সাফিয়া খাতুন,**
আই. ই. আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ১৪ ঃ বিষয় ঃ **শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ভূমিকা।**

সভাপতি ঃ **ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক,**
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

● প্যানেল নং ১৫ ঃ বিষয় ঃ **প্রাথমিক শিক্ষার মান ও পরিবেশ।**

সভাপতি ঃ **বেগম আজিজুন নেসা,**
যুগ্ম জনশিক্ষা পরিচালক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১

বিষয় ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, গবেষণা, পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।

সময় ঃ ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬

সভাপতি ঃ ডঃ **এম, হাবিবুল্লাহ,** ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব সাখাওয়াত আলী খান।**

এই প্যানেল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনাব জাকির হোসেন, ডঃ এ. কিউ. সরকার, ডঃ মোঃ মনিরুজ্জামান, এ. এ. এম. বাকের, এস. কিউ. হোসাইন, সাইফুল ইসলাম, নুরুদ্দীন, শামসুল হক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আবদুল লতিফ মিয়া, ডঃ শামসুদ্দীন আহমদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব সফিউদ্দীন জোয়ারদার, ডঃ জিল্লুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব এম. আই. চৌধুরী, জনাব মোঃ রফিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট **সদস্য জনাব আ, ফ, ম, সফিয়ুল্লাহ।**

আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সুপারিশসমূহ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

আলোচনাঃ আলোচনাকারীগণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আধুনিক, গতিশীল ও বাস্তবমুখী সিলেবাস প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখেই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাঁরা সাবসিডিয়ারী বিষয়কে মূল অনার্স বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাশ কোর্সের মত অনার্সেও ইংরেজী বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেন।

www.pathagar.com

গবেষণা সম্পর্কে তাঁরা বলেন, গবেষণার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং গবেষণার প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। এবং গবেষণার ফলাফল প্রকাশনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। তারা আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক তাঁদের আরম্ভ করা কাজ অসমাপ্ত রেখে যেন ফেলোশীপ বা চাকুরী নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমাতে না পারেন তার প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংগ্রহ নয়, তার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ না থাকায় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান অসুবিধাজনক হয়ে পড়ায় বিভিন্ন বিষয়ের বই যেন বাংলায় লিখিত হতে পারে তৎপ্রতি জরুরী ভিত্তিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত দরকারী বইয়ের বংগানুবাদের ত্বরিৎ ব্যবস্থা করা দরকার। যেহেতু দুর্লভ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা ব্যয় বহুল সেই জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তাবিত রেফারেন্স লাইব্রেরী বাস্তবায়নে মঞ্জুরী কমিশন ত্বরান্বিত ভূমিকা নিতে পারেন।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী দেশের বর্তমান সামাজিক ও প্রকৌশলগত অবস্থার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরী করতে হবে এবং প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীও এই পাঠ্যসূচীর সংগে সংগতিপূর্ণ করে বিন্যস্ত করতে হবে।

২। সাবসিডিয়ারী বিষয়সমূহকে মূল অনার্স বিষয়ের অংগীভূত করতে হবে।

৩। ভাষা হিসাবে ইংরেজীর মর্যাদা নির্ধারণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পাশ ও অনার্স কোর্সে একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৪। দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিদেশে চাকুরী সংগ্রহের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তা এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে

www.pathagar.com

যাতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। কোর্স পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে মান অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখতে হবে।

৭। ক্লাশ নেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকগণ যাতে অধিকতর যত্নবান হন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮। ক্লাশে নাম ডাকার ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হোক।

৯। ক্লাশ রুটীন এমনভাবে করা হোক যাতে সিনিয়র শিক্ষকগণের প্রশাসনিক কাজ ক্লাশ ব্যাহত না করে।

১০। গ্রন্থাগারে যে সব পুস্তকের পর্যাপ্ত কপি নেই, সে সব গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সাইক্লোষ্টাইল করে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

১১। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী বাছাই কালে তাঁদের যোগ্যতা ও বিভাগীয় প্রয়োজন বিবেচনা করতে হবে।

১২। একটি বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে না রেখে তাঁদেরকে কোন বিভাগে বা ইনষ্টিটিউটে একত্রিত করে উহাকে ঐ বিষয়ের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

১৩। শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক। এ ব্যাপারে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনার মান ইত্যাদির ভিত্তিতে পয়েন্ট পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

১৪। যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হওয়া উচিত, বিভাগীয় পদ শূন্যতার ভিত্তিতে নয়।

www.pathagar.com

১৫। প্রখ্যাত পন্ডিতগণকে কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আজীবন জড়িত না রেখে ভিজিটিং অধ্যাপক রূপে অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনার সুযোগ দান করা উচিত। জাতীয় অধ্যাপকগণেরও এই রূপ ভূমিকা বাঞ্ছনীয়।

১৬। বিভাগীয় শিক্ষা কাজে লাগে এমন বিষয়েই উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা উচিত এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের পর ফিরে এসে তিনি যাতে সে বিষয়ই পড়াতে পারেন সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭। গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক বিভাগে এমন একজন অধ্যাপক থাকতে হবে যিনি তরুণ শিক্ষকগণকে গবেষণা কাজে উৎসাহিত করতে পারেন।

১৮। সীমিত সম্পদেরও উপযুক্ত ব্যবহারে নিশ্চয়তা আবশ্যক। সামান্য সম্পদেও গবেষণা সম্ভব। ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা হেতু সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার অনেক সময় হয় না। শিক্ষকগণ তাঁদের রচিত প্রবন্ধের বা গবেষণা মনোগ্রাফের সাইক্লোস্টাইল করার খবরও পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৯। ছাত্রদের গবেষণার ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে চলছে না। অনেক ছাত্র তাঁদের পি-এইচ. ডি. বা এম. ফিল. গবেষণা ত্যাগ করে চলে যান। এর কারণ সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎসাহ যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে বিষয় নির্ধারণ সুষ্ঠু হওয়া দরকার।

২০। গবেষণার প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধা থাকা দরকার। শিক্ষককে ক্লাশের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের পর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে গবেষণা নির্দেশকের কাজ করতে বলা ঠিক নয়।

২১। গবেষণার ফলাফল প্রকাশনার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকরী প্রকাশনা কর্মসূচী থাকা দরকার।

২২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কি গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে তা যাতে

www.pathagar.com

অন্যান্যরা জানতে পারে তার জন্য এনোটেটেড গবেষণা ডাইরেক্টরী বা ডাইজেস্ট বা ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রকাশ করা উচিত।

২৩। সমাজ বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের শিক্ষকদের জন্য গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা দরকার।

২৪। গবেষকগণ যেন দেশের সমস্যা নিয়ে কাজ করেন সে ব্যাপারে নজর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা নির্দেশকের কাজ করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞকে চাকুরী দিয়ে বা সাহায্য হিসাবে আনতে হবে।

২৫। মঞ্জুরী কমিশন বর্তমানে শিক্ষক বিশেষকে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা প্রকল্প দিচ্ছেন। এই ব্যবস্থা একটি সঠিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে হওয়া উচিত যাতে গুণগতভাবে গবেষণা কাজ শেষ করার জন্য দায়িত্ববোধ গড়ে উঠে।

২৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক তাঁদের আরম্ভ করা কাজ অসমাপ্ত রেখে ফেলোশীপ বা চাকুরী নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যাতে কেউ যেন তাঁর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি না পান।

২৭। গবেষকগণের পছন্দমত বিষয়ে গবেষণা করার স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক নয়। জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়োজন বিবেচনা করে গবেষণা প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভুক্তি হওয়া দরকার।

২৮। রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান জনগণের নজরে আনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২৯। গবেষণার গুণগত মূল্যায়ন আবশ্যক। এর জন্য একটা বিশেষ কার্যক্রম সৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য নেওয়া যায়।

৩০। বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ না থাকায় বাংলায় শিক্ষাদান

www.pathagar.com

অসুবিধাজনক। এজন্য বাংলায় বই লেখা উচিত। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে বাংলা একাডেমীর সংগে যুক্তকরণ বাংলায় বই লেখানো ও প্রকাশনার কাজে শিথিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা একাডেমী যেন পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ দ্রুত করতে পারে তার প্রতি নজর দেওয়া আবশ্যক।

৩১। বই লেখার কাজের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কেও নিতে হবে। এর জন্য বেতনসহ ছুটি দিয়ে বই লেখার কাজের দায়িত্ব শিক্ষকদের দিতে হবে। বিষয় বিশেষের উপর শিক্ষকদের কাজের জন্য সেমিনার ডাকা যায় এবং প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের মত সুন্দর ও আরামপ্রদ পরিবেশে পাঠান যায়।

৩২। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় লেখা দরকারী বইয়ের বংগানুবাদের ব্যবস্থা করা দরকার।

৩৩। শিক্ষক উন্নতমানের পাঠ্যবই লিখলে তাকে গবেষণার বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩৪। গ্রন্থাগারে বইয়ের অভাব দূর করার জন্য আর্থিক বরাদ্দের বৃদ্ধি প্রয়োজন ও গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

৩৫। সাজ সরঞ্জাম ক্রয় বা সংগ্রহের জন্য যত প্রচেষ্টা চালানো হয়, এগুলি স্থাপন ও ব্যবহার যোগ্য করণের জন্য সেইরূপ প্রচেষ্টা চালানো হয় না। অনেক সময় যন্ত্রাংশ পেতে অযথা বিলম্ব ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়কে একাজের জন্য সরাসরি লাইসেন্স দেওয়া উচিত। শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে অনেক বিভাগ এখনো অবহেলিত। এদিকে নজর দেওয়া উচিত। বাণিজ্য ও কৃষি শিক্ষায় অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি বিবেচনা করতে হবে।

৩৬। দুর্লভ গ্রন্থ ও বিভিন্ন বিষয়ের ষ্ট্যান্ডার্ড জার্নাল দ্বারা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সজ্জিত করা ব্যয়বহুল। সেজন্য মঞ্জুরী কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তাবিত রেফারেন্স লাইব্রেরীর প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করুক।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—২

বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি।**

সময় ঃ ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬

সভাপতিঃ ডঃ **এ. এফ. এম. সালাউদ্দীন,** জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া।**

এই প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মঈনউদ্দীন খান, কামাল উদ্দীন আহমদ, ডঃ জালালুর রহমান, ডঃ কে. এম. মহসীন, ডঃ নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, মাহবুব উল্লাহ, ওবায়দুর রহমান, শান্তি নারায়ণ ঘোষ, আজিজুর রহমান, মাহতাব আলী, বি. আর. রহমান, এবং মিসেস খাদিজা খাতুন।

আলোচনার সার সংক্ষেপ ও সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

আলোচনাঃ আলোচনাকারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন ঃ—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি।

(২) মেধা ও যোগ্যতাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের একমাত্র ভিত্তি।

(৩) মেধা ও যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি।

(৪) এই পদ্ধতিগুলো জাতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষার মান নির্ণয়ক সংস্থার মাধ্যমে হতে পারে। অথবা বিভিন্ন বিশ্বা-

www.pathagar.com

বিদ্যালয় তাঁদের নিজেদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করবেন। ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া কাউকে ভর্তি করা চলবে না। এর মধ্যে কেউ মনে করেন ভর্তির ব্যাপারে প্রার্থীর বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে এ্যাপটিচ্যুড নির্ধারণের জন্য উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৫) ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে বহিরাগত কোন চাপের প্রতি কর্তৃপক্ষ কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না।

(৬) দেশের ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ও ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা অর্থাৎ সৃজনশীল জ্ঞানদীপ্ত মানুষ গড়ে তোলা, কেবল মাত্র জীবিকা অর্জনের পথ নির্দেশ করা নয়, সেই হেতু সমাজের চাহিদা মিটানোর প্রশ্নটি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে বিচার করতে হবে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগসমূহে ভর্তি পরীক্ষা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোর ভর্তির পরে নিতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলো ড্রপ আউট সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

(৮) প্রত্যেক বিভাগের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা আগে থেকে নির্ধারণ করতে হবে।

(৯) ভর্তির 'সময়' এবং 'প্রক্রিয়া' যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন।

সুপারিশসমূহঃ

১। জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে কেবলমাত্র মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে যথারীতি পরীক্ষা, নিরী-

www.pathagar.com

ক্ষার মাধ্যমে বহিরাগত চাপকে উপেক্ষা করে ছাত্র ভর্তির নীতিতে অটল থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমিক গবেষণায় ছাত্রকে উৎসাহিত করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে।

২। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির পর বিজ্ঞান বিভাগসমূহে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। প্রত্যেক ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে গবেষণা কাজে লিপ্ত রাখতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৩

বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি**

সময় ঃ **৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **ডঃ এ. কে. এম. সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব তোফাজ্জল হোসেন।**

এই প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব-জনাব ডঃ আশরাফউদ্দীন চৌধুরী, ডঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, ডঃ জিয়া-উদ্দীন আহমদ, ডঃ কে. এম. মান্নান, ডঃ এ. কিউ. সরকার, জে. চৌধুরী. এম. এম. মুসা, বেগম জাহানারা, মিস্ নাসীমা ফেরদাউস, আই. বি. এ. এর ডঃ মাজহারুল হক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মিসেস্ হোসনে আরা কামাল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব মোহাম্মদ হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব এইচ. আজিজুল হক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ. এস. এম. কামালুদ্দীন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব আই. নিশাত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ আবদুল গফুর।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ ও সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হলো।

আলোচনা ঃ অধিকাংশ আলোচনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত পরীক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, একজন অনার্স পরীক্ষার্থীকে তার তিন বৎস-রের পাঠকাল শেষে একত্রে সবগুলো পত্রে পরীক্ষা দিতে হয়, এটা কোন সন্তোষজনক পদ্ধতি নয়। কারণ এর দ্বারা ছাত্রের প্রকৃত মেধা যাচাই করা সম্ভব হয় না। তাঁরা মনে করেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের অন্তবর্তীকালীন সময়ের পরীক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা পুরানো পদ্ধতিতে সকল পেপারের এক সঙ্গে পরীক্ষা নিলে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য

www.pathagar.com

কতকগুলো বাছাই করা প্রশ্ন আয়ত্ব করতে পারে এবং এতে তাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত থাকার সম্ভাবনা থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিভাগে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত 'কোর্স সিস্টেম' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পদ্ধতি প্রচলনের পূর্ব শর্ত হিসেবে তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ঠিক করার, পাঠ্য পুস্তক, গবেষণাগার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর বিশেষ জোর দেন। তবে তাঁরা মনে করেন. বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সব কলেজে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স রয়েছে, সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত এই পদ্ধতি চালু করা উচিত নয়।

অধিকাংশ আলোচনাকারী মনে করেন যে, সরাসরি কোর্স পদ্ধতিতে না গিয়ে বর্তমানে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, যা ছাত্রদের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে সহায়ক হবে। শতকরা ৪০ ভাগ নম্বরের আভ্যন্তরীণ ও ৬০ ভাগ নম্বরের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়। তাঁরা মনে করেন, কোর্স ফাইনাল পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষক রাখার প্রথা অব্যাহত রাখা উচিত।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। যেহেতু প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি নির্দিষ্ট কয়টি বৎসরের পাঠকাল শেষে নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমে নিহিত এবং যেহেতু কয়েক বৎসরের প্রশ্নপত্র হতে প্রশ্ন বাছাই করে তার জবাব আয়ত্ব করে সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া এমন কি ভাল করা সম্ভব, সেই হেতু ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত থাকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁকির মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জন করার অবকাশ বিদ্যমান। অতএব পাঠকাল শেষে একমাত্র পরীক্ষা ব্যবস্থার চাইতে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের অন্তবর্তীকালীন সময়ে পরীক্ষা নেয়ার উপর গুরুত্ব প্রদান অত্যাবশ্যক।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিভাগে প্রচলিত 'কোর্স সিস্টেম' প্রথায়

www.pathagar.com

কাংখিত সাফল্য লাভের পূর্ব শর্ত হচ্ছে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ঠিক করা। সেই সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক, গবেষণাগার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কোর্স শেষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষকের উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী।

৩। যে সকল কলেজে অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে সেখানে যোগ্য শিক্ষক ও সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোর্স সিষ্টেম প্রবর্তন করা সমীচীন হবে না।

৪। আকস্মিকভাবে যথাযথ নিয়মানুবর্তী কোর্স সিষ্টেম প্রবর্তন না করে কোর্স শিক্ষকদের দ্বারা টিউটরিয়াল ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হোক। এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা পরিচালনা করবে। আরো সুপারিশ করা হয় যে ৪০% নম্বর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে ধার্য করে ৬০% নম্বর কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার জন্য রাখা হোক।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৪

বিষয় ঃ **কলেজে শিক্ষাদান, গবেষণা, পাঠক্রম, ও অন্যান্য সরঞ্জাম।**

সময় ঃ **৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **জনাব তোফাজ্জল হোসেন**, অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব শ. ম. মুজিবর রহমান**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দঃ সর্বজনাব মোহাম্মদ হোসেন, এম. এন. আলী, জি. এম. আহমদ, আজিজুল হক খান, আবদুর রশীদ ভূঞা, শাহজাহান হাফিজ কাজী নাজমুস সাদাত, এ. এন. এম. বজলুর রহমান, ডঃ হারুনুর রশীদ, আনওয়ারুল ইসলাম, সাফাত আহমদ সিদ্দিকী, ডঃ মোসলেমউদ্দীন, জি. এম. এ. মান্নান, মিসেস মুসতারী বেগম, এম. মোকাররম হোসাইন, মোঃ শরফুদ্দীন ওয়াসী, তাইবুর রহমান, এম. এম. ইসহাক, হাবিবুর রহমান, মোঃ ইউনুফ এবং জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের জনাব আনোয়ার আলী খন্দকার।

সংক্ষিপ্ত প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আলোচনা ঃ আলোচনায় চারটি বিষয়ের উপরই অংশগ্রহণকারীরা বক্তব্য রাখেন। প্রথমতঃ কলেজের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বক্তারা একমত পোষণ করেন যে, বেসরকারী কলেজে শিক্ষাদানের পরিবেশ আদৌ সুষ্ঠু নয়। আর্থিক সমস্যাই এসব কলেজের শিক্ষাদানের মূল সংকট। অন্যদিকে

www.pathagar.com

মুষ্টিমেয় সরকারী কলেজ সরাসরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সচ্ছল। পাশাপাশি এ দু'ধরনের পরিবেশ কলেজ পর্যায়ে কাংখিত পরিবেশের পরিপন্থী। এর সমাধানকল্পে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বক্তাদের অনেকে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাদানের স্তর বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেকে মত প্রকাশ করেছেন, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষাদান একই প্রতিষ্ঠানে সম্ভব নয়। এছাড়াও অনেকে বলেন, উচ্চতর ডিগ্রী পর্যায়ে যাতে সব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী অবাধে ভর্তি হতে না পারে তার জন্য উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী শেষ হওয়ার সাথে সাথে সুষ্ঠু বাছাইয়ের দরকার। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যাতে ব্যবহারিক জীবনে অদরকারী উচ্চ শিক্ষার আধিক্য না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষায়তনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর যৌথ ভূমিকা একান্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। যেহেতু কলেজ পর্যায়ে যে সকল ছাত্র পড়াশুনা করতে আসে, তাদের অনেকেই গড়মান রক্ষা করতে পারে না, সেইহেতু স্কুল পর্যায় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে তৈরী করা দরকার, যাতে তারা কলেজ পর্যায়ে এসে অহেতুক বিড়ম্বনায় না পড়ে। এর জন্য দরকার মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ সমন্বয় যে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় ; এ ব্যাপারে প্রাথ-মিক স্কুল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকলকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

সবাই একমত হন যে, শিক্ষাদানের মান কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত ষ্ট্যান্ডার্ডের উপরে নির্ভর করেনা। শিক্ষকদের শিক্ষা ও শিক্ষা-দানের মানও সমভাবে দায়ী। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর যেমন জোর দিতে হবে, তেমনি শিক্ষক নির্বাচনেও কঠোর নিয়মাবলী মানতে হবে।

কলেজ পর্যায়ে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ হয় দু'টি বিষয়ের উপরেঃ (১) মৌলিক গবেষণার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দেয়া হবে, (২) বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোতে সম্মান পর্যায়ের ছাত্রদেরকে ভবিষ্যৎ গবেষক হিসাবে তৈরী করার জন্য আগে থেকে

www.pathagar.com

প্রস্তুত করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অতীতকালের শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশগুলোর সার্থক রূপায়ন ঘটেনি। এ যাবত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাদানের ফল হচ্ছে কিছুসংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রীধারী সৃষ্টি। নিজের ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার যে শিক্ষা তা বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণ লাভ করেন না বলেই পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। এরা সৃষ্টিধর্মী উদ্ভাবনী শক্তি হতে পারছেনা। প্যানেলের সভাপতি বলেন যে, শিক্ষা সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। দেশের রাজনীতি, সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে এ সমস্যা পৃথক নয়। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই মিলে এক সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষার প্রতি ছাত্র ও অভিভাবক উভয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার প্রতি অনীহা দূর করতে হবে।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। যেহেতু কলেজ পর্যায়ে বেসরকারী কলেজের সংখ্যাই অনেক বেশী এবং অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক কলেজই সরকারী এবং যেহেতু একমাত্র সরকারী কলেজই সরাসরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাক এবং যেহেতু সরকারী ও বেসরকারী কলেজে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে মোট সংখ্যার ১১% এবং ৮৯% সেইহেতু সরকারী ও বেসরকারী কলেজের মধ্যকার সরকারী অনুদান ও আর্থিক সাহায্য বন্টনে বৈষম্য দূর করে জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যবস্হা করতে হবে।

২। দেশের অবস্হার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক জীবনে অদরকারী উচ্চ শিক্ষার প্রবণতা রোধ করে একই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষাদানের প্রচলিত রীতি পরিহার করা, সরকারী উদ্যোগে এবং শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে ডিগ্রী ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ শিক্ষকের গুণগত পর্যায়ক্রমিক

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উপর কঠোর নিয়ম ও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৩। শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ডিগ্রী ও তদূর্ধ্ব স্তরের মধ্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৪। শিক্ষকের মানের চেয়ে শিক্ষার মান উন্নত হতে পারে না, এই কারণে শিক্ষক নির্বাচনের সময় কঠোর নিয়মাবলী মানতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষকদিগের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৫

বিষয় ঃ **কলেজে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি।**

সময় ঃ **৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান,** চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব এস. এম. হোসেন।**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন কলেজ হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দঃ মিসেস বেগজাদী মাহমুদা নাসির, মিঃ এম. জে. হুইলার, শ্রী বারীন মজুমদার, সর্বজনাব আলতামাসুল ইসলাম. আবদুল হাই তালুকদার, দিদারুল ইসলাম, মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ আখতারুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ আবদুল হাই, নঈমউদ্দীন আহমদ, ডঃ এম. এম. আবদুর রহমান, মিসেস হামিদা খানম সৈয়দ হেসামুদ্দীন আহমদ, এ. কে. এম. হায়দার হোসেন, আলী আহমদ রুশদী, মোঃ জায়েদ আলী, এম. এ. বাশার, কে. কে. পাল চৌধুরী এবং জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের ডঃ হাফেজ আহমদ ডি. ডি. পি. আই. এ. এম. এ. রশীদ, প্রকৌশল উপদেষ্টা, মোঃ নোমান, এ. ডি. পি. আই, জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. এইচ. চৌধুরী ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসুল আলম ও এ. এল. খান।

সংক্ষিপ্ত প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আলোচনাঃ কলেজে ছাত্র ভর্তি সম্পর্কে আলোচনাকারীরা বলেন যে, শুধুমাত্র শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সঠিক পদ্ধতি নয়। ভর্তির জন্য লিখিত ও মৌখিক

www.pathagar.com

পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। তবে তাঁরা মনে করেন যে, সরকারী কলেজে এ পদ্ধতি সম্ভব হলেও বেসরকারী কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করলে তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা অধিকতর প্রকট হবে। এ ব্যাপারে কতিপয় আলোচনাকারী বেসরকারী কলেজে ভর্তির জন্য একটি 'জাতীয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। বিকল্প কোন শিক্ষা শাখার ব্যবস্থা না থাকার দরুন উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীও কলেজে এসে ভর্তির জন্য ভীড় করে। কারিগরি কলেজ ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে পাশ করা ছাত্রদের চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই কেননা দেশের শিল্পের সঙ্গে এই শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'জনশক্তি কমিশন' নিয়োগ করে দক্ষ কর্মী ও জনশক্তি জরীপের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এরূপ কোন জরীপের ব্যবস্থা করা হয়নি। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাঁরা বলেন যে, বর্তমানে দেশের বেসরকারী কলেজগুলো আর্থিক দিকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে, তাই কিছু সংখ্যক কলেজকে তুলে দিয়ে বাকীগুলোর মান উন্নত করার জন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বিধান করতে হবে।

পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে তাঁরা অভিযোগ করেন যে, পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির চেয়ে পরীক্ষা পরিচালনার ত্রুটি বেশী। কারণ যাদের উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত, তারাই ছাত্রদেরকে নকলে সাহায্য করেন। অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা শেষ হবার পর মূল্যায়ন করে নিজেরাই সার্টিফিকেট দেবে। এতে আশা করা হয়েছে যে প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি হলেও পরে শিক্ষার মান উন্নত হবে কেননা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও পারদর্শীতার মানদন্ডে বিচার করেই একজন ছাত্রকে নির্বাচন করবে, প্রতিষ্ঠানের দেওয়া সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে নয়। কাজেই যেখানে ভাল লেখাপড়া হয় তথাকার ছাত্ররাই সর্বত্র সমাদৃত হবে এবং এই পন্থা অবলম্বন করলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজেদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতা চলবে। তাঁরা বলেন যে, শিক্ষা একটি জাতীয় দায়িত্ব, সুতরাং এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে।

www.pathagar.com

সুপারিশসমূহ ঃ

১। কেবলমাত্র শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি না করে ভর্তির জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন এবং এই ব্যবস্থায় বেসরকারী কলেজে অর্থনৈতিক অসুবিধা অধিকতর প্রকট হবে বিধায় বেসরকারী কলেজে ভর্তির জন্য একটি 'জাতীয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি' প্রতিষ্ঠার ভাবনা-চিন্তা দরকার। দেশের বর্তমান বেসরকারী কলেজসমূহ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে বলে অপ্রয়োজনীয় কলেজগুলি তুলে দিয়ে বাদবাকীগুলোকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে।

২। পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির চাইতে পরীক্ষার পরিচালনার ত্রুটিই বেশী বলে পরীক্ষা পরিচালনাকারীদের নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগানোর প্রতি সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৬

বিষয় ঃ **মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।**

সময় ঃ **৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬।**

সভাপতি ঃ **ডঃ এ. কে. এম. আমিনুল হক,** কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব মোশতাক এলাহী**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুল থেকে আগত ডেলিগেটবৃন্দঃ সর্বজনাব আবদুর রহিম, মোঃ ইসহাক, ফাইজুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, মিসেস মাহমুদা খাতুন, মিসেস সালেহা মাহতাব, শ্রী যোগেন্দ্র চন্দ্র রায়, নাজিরুদ্দীন ভূইয়া, জয়নুল আবেদীন, মোঃ জিয়ারত আলী, মোঃ ইউনুস, মিসেস মাহমুদা বেগম, মোহাম্মদ কাদের বক্স, এ. কে. মাহমুদুল হক, শান্তিময় চাকমা, সিরাজুল হক, মিসেস আয়েশা চৌধুরী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দঃ ডঃ এ. এইচ. এম. করিম, আবুল হাসেম, মোহাম্মদ মহসীন, মিসেস মালিহা খাতুন ও জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের সিরাজুল ইসলাম খান, মোঃ ইউনুস মিয়া, এ. এন. চৌধুরী, আবুল খায়ের আহমাদান, মিসেস তাবেনদা আখতার।

সংক্ষিপ্ত প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

আলোচনা ঃ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের জনগোষ্ঠীকে জাতীয় কল্যাণমূলক সৃজনধর্মী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা দরকারঃ প্রাথমিক স্তরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নাগরিকত্ববোধের উন্মেষ সাধন, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণসমূহের পূর্ণতর বিকাশ সাধন এবং উচ্চতর স্তরে দেশের চাহিদানুযায়ী বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্তরের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশ-সমূহ করা হয়।

আলোচনাকারীগণ মত পোষণ করেন যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার মানে আশংকাজনক অবনতি ঘটেছে। সকল স্তরের জনগণের মধ্যে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দারুণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। শিক্ষাদানের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সকলকেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, বিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা উন্নতমানের শিক্ষাদানের পথে দুর্লংঘ্য অন্তরায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাতারাতি অসংখ্য বিদ্যালয় গজিয়ে উঠায় অনেক ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়েও ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন ছাত্র বেতনলব্ধ আয়ও কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ শুধু ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন বেশ কয়েকমাস পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারী, রেসিডেনসিয়াল মডেল, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি বেশ কয়েকপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। কতিপয় নীতিগত ব্যাপারেও এসবের মধ্যে এমন বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান যা কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। সরকারী অনুদানের পরিমাণ পূর্বের মতই রয়ে গেছে অথচ মুদ্রার অব-মূল্যায়ন হয়েছে কয়েক দফা। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য অনেক শিক্ষককে সম্পূরক এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট ট্যুশানির মত অনাকাঙ্খিত পেশা অবলম্বন করতে হয়। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য ঐ সমস্ত শিক্ষকের কর্মশক্তি ও মনোনিবেশ কম হওয়ারই কথা। তাছাড়া প্রাইভেট ছাত্র পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

শিক্ষার মানের অবনতি প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, প্রাথমিক স্তরে ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম ও শিক্ষাদানের ফলে অসম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় মাধ্যমিক স্তরে এসে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে দারুণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার প্রভাব কমবেশী অভিভাবক, ছাত্র সমাজ ও শিক্ষক সমাজেও এসে লেগেছে। শিক্ষা-

www.pathagar.com

দানের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব রয়ে গেছে। কেবল মাত্র সামান্য কতকগুলি সুবিধার জন্য অনেক অভিভাবক তাদের সন্তান-দেরকে এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে নিয়ে পরোক্ষভাবে হলেও প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে নসাৎ করে দেন।

কতিপয় আলোচনাকারী ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে যুক্তি দেন। তাঁরা আরও বলেন যে, হস্তলিপি, প্রতিলিপি, শ্রুতলিপি, হিতোপ-দেশ, মানচিত্র পাঠ, মানসাংক প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বেকার মত শিক্ষা দান ব্যবস্থা চালু থাকা দরকার। তাঁরা বলেন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি পৃথক 'জাতীয় পাঠ্যপুস্তক পরিষদ' গঠন করা প্রয়োজন।

পাঠক্রম প্রসঙ্গে আলোচনাকারীগণ উল্লেখ করেন যে, দেশে একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে পাঠক্রমে একটা বিরাট অসমতা দেখা যায় সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে যেখানে টেক্সট্ বুক বোর্ড প্রকাশিত পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হয় না সেখানে ক্যাডেট কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের সেরা প্রকাশনার সেরা পুস্তকসমূহ পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী ভাষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ঐ ভাষার ব্যাপক অনুশীলন করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের পাঠক্রম পুস্তকভারাক্রান্ত। এই পাঠক্রম থেকে অনেক বিষয় বাদ দেয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমাজ পাঠ থেকে পৌরনীতি বাদ দিয়ে ইতিহাস ও ভূগোলের অর্থবহ ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ দেয়া যেতে পারে।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। আর্থিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাব শিক্ষক-গণকে নিজেদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অন্তরায় স্বরূপ কাজ করে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যকার পার্থক্য দূর করে তাঁদেরকে সামাজিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২। শিক্ষকের পেশাগত মানের সঙ্গে শিক্ষার মান সম্পৃক্ত। জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাঁকে আনুষংগিক লেখাপড়ার চর্চা করতে হবে। অভিযোগ উঠেছে অনেক শিক্ষকেরই শিক্ষার মান নিম্ন। বিগত বছর-গুলোতে রাজনীতির জোয়ারে এদের অনেকে চাকুরী লাভ করেন। শিক্ষা-

www.pathagar.com

দানের প্রতি এদের সহজাত প্রবণতা না থাকারই কথা। এদের পরিবর্তে আদর্শ শিক্ষক খুঁজে বের করতে হবে।

৩। শিক্ষকদের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রশিক্ষণেরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে পূর্ণ বেতন ও উপযুক্ত হারের প্রশিক্ষণভাতাসহ ছুটি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে হবে।

৪। নিষ্ঠাবান ও দক্ষ শিক্ষককে যে কোন মূল্যে শিক্ষকতায় ধরে রাখতে হবে। আর নিবেদিত প্রাণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, আদর্শ শিক্ষককে উৎসাহিত করার জন্য উপযুক্ত পারিতোষিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। শিক্ষকগণের চাকুরীর স্থায়িত্ব, প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম, গ্র্যাচুয়েটি, টিচার্স বেনিফিট ফান্ড ইত্যাদি ব্যাপারে অন্যান্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দূর করতে হবে।

৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ যুক্তি-যুক্ত নয়। শ্রেণী সংখ্যা ও পাঠদানের বিষয় সংখ্যার উপর শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারিত করতে হবে।

৭। কাপ্তাই হ্রদ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার উপর যে বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে, তাতে ঐ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারী সাহায্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হতে হবে।

৮। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বয়স, তার বুঝবার ও শিখবার ক্ষমতা ইত্যাদি সঠিকভাবে বিবেচনা না করেই অনেক পাঠ্যবিষয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমান পাঠক্রম থেকে অল্প প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে বিষয় সংখ্যা নির্ধারিত করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

৯। একটা আন্তর্জাতিক ভাষা এবং বাংলাদেশের পটভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে শিক্ষার জন্য

www.pathagar.com

অপরিহার্য ভাষা হিসেবে ইংরেজী শিক্ষাদান ৩য় শ্রেণী থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

১০। সস্তাদামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার নামে টেক্সট্ বুক বোর্ড যে সমস্ত পুস্তক সরবরাহ করে আসছেন তাতে অজস্র ভুল, প্রমাদ, অস্পষ্ট মুদ্রণ, বক্তব্য বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতা থেকে যায় এবং পুস্তক-গুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত অনাকর্ষণীয়, পরিণামে শিক্ষার্থীদের মন তাতে না বসার ফলে শিক্ষাদান কার্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই প্রভাবিত করে। তাই যে কোন মূল্যে পাঠ্যপুস্তকসমূহকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করতে হবে।

১১। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে হিতোপদেশ দেয়ার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। জনসংখ্যা সমস্যা বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরে উপ-স্থাপিত করতে হলে তার এপ্রোচ পরিবর্তন করতে হবে।

১২। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি পৃথক 'জাতীয় পাঠ্যপুস্তক পরিষদ' বা 'ন্যাশনাল টেক্সট বুক কাউন্সিল' গঠন করতে হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করেই প্রস্তা-বিত পরিষদ পুস্তক প্রণয়নের জন্য লেখক নির্বাচন, পুস্তক প্রণয়ন সম্পাদন চিত্রায়ন ইত্যাদির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল ষ্টাডিজ (এআইবিএস) কর্তৃক গঠিত বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ক্যারিকুলাম ষ্টাডিজ (বিএসসিএস) এর অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এজন্য নির্বাচিত লেখকবৃন্দকে পুস্তক প্রণয়নকালীন সময়ের জন্য অন্য সব দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে পুস্তক প্রণয়ন কাজে একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ করার যাবতীয় সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

১৩।টেক্সট্ বুক বোর্ডের পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে একচেটিয়া স্বত্ব বন্ধ করে তাদেরকে শুধু প্রডাকশান ও ডিষ্ট্রিবিউশানের দায়িত্বে রাখতে হবে।

১৪। পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রতিযোগিতা থাকতে হবে। সস্তা নোট বই ওঅন্যান্য সাহায্য পুস্তক প্রকাশ বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫। কতিপয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যবই ছাড়াও শিক্ষকের জন্য টিচার্স গাইড প্রণয়ন করতে হবে।

১৬। অনেক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী নেই, থাকলেও বইপত্র নেই। প্রায় বেসরকারী বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য পরীক্ষণাগার নেই। শুধু তাই নয় অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, বেয়ারারও নেই। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে।

১৭। অনেক বিদ্যালয়ে কোন রকম পরীক্ষণাগারের সুযোগ-সুবিধে না থাকা সত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে। শুধুমাত্র ভাল ছাত্র এবং বেশী সংখ্যক ছাত্র ধরে রাখার এই অবাঞ্ছিত প্রবণতা রোধ করতে হবে।

১৮। পাকিস্তান আমলের বরাদ্দকৃত ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকায় যেখানে সামান্য একটা ক্ষুদ্রকক্ষ নির্মাণও সম্ভব নয়, সেখানে বর্তমান বাজারে ঐ টাকায় যথাযথ পরিমাপের পরীক্ষণাগার নির্মাণের প্রশ্নই উঠে না, এ ব্যাপারে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে সক্রিয় কর্মব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯। ক্যাডেট কলেজ, সরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় ইত্যাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভূমিকা অনুধাবন করে শিক্ষাখাতে সরকারী বরাদ্দের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হবে।

২০। ক্যাডেট কলেজের মত ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হলে তা সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের অর্থানুকূল্যে হতে হবে।

২১। বিভিন্ন 'টিচিং এইড' এর ব্যবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের জন্য টিচার্স ম্যানুয়েল তৈরী করে সরবরাহ করতে হবে।

২২। অনেক বিদ্যালয় বিনামূল্যে বা সল্পমূল্যে প্রাপ্তব্য সরঞ্জামাদি কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে, এ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাদের এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে। এবং তাদের জন্য এসব উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৭

বিষয় ঃ **মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি।**

সময় ঃ **৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬।**

সভাপতি ঃ **ডঃ শামসুদ্দীন মিয়া,** চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব কাজী মান্নান।**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুলসমূহ থেকে আগত ডেলিগেটবৃন্দঃ সর্বজনাব আবদুল জাব্বার, মোঃ ময়দান আলী, খন্দকার আবদুর রাজ্জাক, ইরতাফুর হোসেন, ফিরোজা সুলতানা, আবদুর রশিদ মিয়া, মোজাম্মেল হক, নাসিমা হায়দার, খন্দকার মোঃ আলী, জালালউদ্দীন আহমদ, মোঃ বজলুল হক, এ. কে. এম. আমজাদ হোসেন, কে. বি. এম. শামসুল হক, মাযহারুল ইসলাম, মোঃ সাদত আলী, মোঃ মোকাররম হোসেন, আলী আক্কাস, মোহাম্মদউল্লাহ, রুহুল আমীন চৌধুরী, আবদুর রহিম, চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের বাকী বিল্লাহ খান, সৈয়দা জাহানারা করিম, শামসী মোমেন জোবেদা খাতুন ও স্কুল পরিদর্শকবৃন্দ আবদুল মান্নান, ইদ্রিস আলী, শাকের আহমদ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

আলোচনাঃ আলোচনাকারীগণ মাধ্যমিক পর্যায়ের নানাবিধ সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রত্যেক স্কুল বৎসরের প্রথম দুই এক মাসের মধ্যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভর্তি শেষ করবে। ভর্তি ও ছাড়পত্র প্রদানের প্রশ্নে নিয়ম ও শৃংখলা সকলকেই মেনে চলতে হবে এবং অসাধু উপায় বর্জন করে চলবে। ১৯৭৩ সনের স্কুল কমিটির রেগুলেশনের আশু সংস্কার প্রয়োজন। শৃংখলা ভঙ্গকারী স্কুলগুলি সম্পর্কে জনশিক্ষা

www.pathagar.com

দফতরকে অধিকতর তৎপর হতে হবে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঐ স্কুলের আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিতে হবে। যেহেতু স্কুলে ভর্তির যোগ্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির ব্যবস্থা করা অভিভাবকগণের নিম্নতম দাবী, সেহেতু এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

প্রতি বৎসর মাসিক ভিত্তিতে অন্ততঃ ছয়টি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এই সবের সমষ্টিগত ফলাফল টারমিনাল ও বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের গোচরে আনতে হবে। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত হতে সাহায্য করবে। পরীক্ষায় সব রকমের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। মূল্যায়নে বিভিন্ন পরীক্ষক ও বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে মূল্যায়ন বৈষম্য পরিহার করতে হবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহ রক্ষা কল্পে ভাঁইফোড় ও অপ্রয়োজনীয় স্কুলের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন। অবাঞ্ছিত স্কুলসমূহের মঞ্জুরী প্রত্যাহারের প্রশ্নও বিবেচ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণ ও অভিভাবকগণের সহানুভূতি ও আর্থিক আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন, শুধু ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিতেই স্কুলের আর্থিক সমস্যা সমাধান কাম্য নয়। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী কমিটির অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে স্কুলের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম তথা ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা প্রহসন মাত্র। শিক্ষকগণের একটি বৃহৎ অংশ পেশাদারী টিউশানীতে লিপ্ত থাকায় পাঠক্রম অবহেলিত হয় এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ছাত্র সমাজের বিশেষ উপকারে আসে না। অবহেলিত ছাত্র সমাজ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাইভেট টিউটর, বাজারের নোট বই ও নকল এগুলোর উপরেই ভরসা করে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নমালা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত প্রস্তুতি ও মেধার নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করে না। সাফল্য যেমন জীবনের কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে না তেমনি ব্যর্থতা পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচারের স্বাক্ষর বহন করে না। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিচ্ছবি নয় বরং স্মৃতি-শক্তির পরীক্ষা

www.pathagar.com

যা ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কাজে আসে না। এতে তার প্রবণতা, স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভা কিছুরই প্রতিফলন হয় না। এরূপ পরীক্ষা পাশের সার্টি-ফিকেট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারের পক্ষে সহায়ক হয় না। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা কেন্দ্র অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করে। পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনাকালে গ্রেস (খয়রাতি) নম্বর পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত ও শিক্ষার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহ আদৌ নির্ভরযোগ্য হয় না কারণ অধিকাংশ স্কুলে ব্যবহারিক বিষয়ে যথাযথ দীক্ষা দেওয়া হয় না।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্কুল বৎসরের প্রথম ২/১ মাসের মধ্যেই ছাত্র ভর্তি শেষ করবে। এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ন্যায় ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীতে বৎসরের প্রথম ২/১ মাসের মধ্যে নতুন ভর্তির কাজ শেষ করতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ রোধকল্পে জনশিক্ষা পরিচালনালয় অধিকতর তৎপর হবেন।

২। ভর্তি ও ছাড়পত্র প্রশ্নে অসাধু উপায় পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে জন-শিক্ষা পরিদপ্তর ও বোর্ডসমূহ অধিক তৎপর হবেন।

৩। ছাত্র ভর্তির নীতিমালা প্রত্যেক স্কুলকে অবশ্য পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার করতে পারেন। নিয়ম ভঙ্গের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সুসংহত ও ত্রুটি-মুক্ত করতে হবে। এজন্য ৫ম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা জাতীয় ভিত্তিতে প্রবর্তন করতে হবে। জনশিক্ষা পরিদপ্তর, জেলা স্কুল পরিদর্শক ও মহকুমা স্কুল পরিদর্শক পর্যায়ে উক্ত সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী শেষে অনুরূপ সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীকে সময় মত বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে উৎসাহিত করা যায় অন্যদিকে একটি চরম অপচয় ও হতাশা থেকে ব্যক্তি, পরিবার ও জাতিকে রক্ষা করা যায়।

www.pathagar.com

৫। স্কুলের বর্তমান নির্বাহী কমিটি ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, এজন্য ১৯৭৩ সনের স্কুল কমিটির রেগুলেশনের আশু সংস্কার করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাহী কমিটিসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য স্থানীয় বেসরকারী স্কুলসমূহের জেলা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭। প্রতিটি স্কুলের সার্বিক শৃংখলা ও শিক্ষাদান পর্যবেক্ষণার্থে নিয়মিত কার্যকরী পরিদর্শন বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য স্কুল পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৮। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির ব্যবস্থা অভিভাবকগণের নিম্নতম দাবী। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।

৯। মাসিক পরীক্ষার সমন্বিত ফলাফল টারমিনাল, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সহিত সংযুক্ত হয়ে ছাত্রের সফলতানির্ণয় ও পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশনের সাহায্য করবে। সমস্ত ছাত্রের সমস্ত পরীক্ষার রেকর্ড রাখতে হবে এবং নিয়মিতভাবে প্রোগ্রেস রিপোর্ট অভিভাবকের নজরে আনতে হবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার নম্বরের পাশাপাশি স্কুলের আভ্যন্তরীণ রেকর্ড ও সমন্বিত হবে।

১০। প্রশ্নপত্র তৈরীতে কিছু রচনামুখী প্রশ্ন, কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকবে যাতে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা প্রতিফলনের সুযোগ থাকবে। আদর্শ প্রশ্নপত্র বোর্ডসমূহ শিক্ষা পরিদপ্তর বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় তৈরী করে ছাত্র-শিক্ষকগণের সুবিধার্থে বিতরণ করতে পারেন। ব্যবহারিক পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রতিটি স্কুলে ব্যবহারিক বিষয়ের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করতে হবে এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকগণের উপরে অন্যায় চাপ সৃষ্টি, প্ররোচনা ও হুমকী দূর করতে হবে। সর্বপ্রকার গ্রেস (খয়রাতি) নম্বর দেওয়া বন্ধ করতে হবে যাতে ছাত্র সমাজ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে।

www.pathagar.com

১১। পরীক্ষায় সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে, প্রয়োজনবোধে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে পরীক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করে সুস্থ, শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

১২। মূল্যায়ন অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। বোর্ডসমূহ সম্মিলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নীতিমালা পরীক্ষকগণের সুবিধার্থে প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে পারেন। মূল্যায়নে বিভিন্ন পরীক্ষকের মধ্যে বৈষম্য ও বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে মূল্যায়ন বৈষম্য পরিহার করতে হবে।

১৩। ত্রুটিহীন মূল্যায়ন সুস্থ স্কুল পরিবেশ, দক্ষ, অভাবমুক্ত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককুলের উপর নির্ভরশীল। বাইরের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ভীতি থেকে পরীক্ষা ও পরীক্ষককে মুক্ত রাখতে হবে। দক্ষ শিক্ষককুলই কেবল দক্ষ পরীক্ষক হিসাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার আবর্তে নিমজ্জিত অসহায় শিক্ষক থেকে ভাল পরীক্ষণ বা ভাল মূল্যায়ন আশা করা যায় না। এই কারণে শিক্ষকদিগকে পরিবার পরিজনসহ ভদ্র জীবন-যাপনের উপযোগী অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে ও সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ দায়িত্ব পালনের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—৮

বিষয় ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি।**

সময় ঃ **৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **ডঃ মফিজুল্লাহ্ কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব সাখাওয়াত আলী খান।**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনাব ডঃ মেসবাহউদ্দীন আহমদ, ডঃ আজিজুল হক, প্রীতিকুমার মিত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সফিউদ্দীন জোয়ারদার, গোলাম কবীর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদ হাবিবুর রহমান, মোঃ রেফায়েতউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহবুবুর রহমান, ডঃ আশরাফউদ্দীন চৌধুরী, সুলতান আহমদ, ডঃ এ. কে. কামালউদ্দীন, ডঃ লুৎফুল হক চৌধুরী, শান্তি নারায়ণ ঘোষ, ডঃ এ. এন. এম. আজিজুর রহমান, সরোয়ার হোসাইন, নাসিরউদ্দীন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আবদুর রাজ্জাক, ডঃ সৈয়দ গিয়াসউদ্দীন, ডঃ সোমেন দেওয়ান, মোঃ আতাউর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ. এম. সিরাজউদ্দীন, ডঃ শফিকুল হায়দার চৌধুরী, এ. ওয়াই. এম. শামসুল আলম, মোঃ আবদুল হাই।

আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুপারিশসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

আলোচনা ঃ আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সীমিত হওয়া উচিত। আলোচনাকারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাজের বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা উচিত। পাঠ্যসূচীতে মূল পঠনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে সহপাঠক্রম হিসাবে

www.pathagar.com

সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য-চর্চা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, ব্যবহারযোগ্য ভাষা, ছুটি, শিক্ষক ও নানাবিধ সমস্যা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃঅনুষদীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের ছাত্রদের জন্য যথাক্রমে সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে সাবসিডিয়ারী বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কেকোন কোন বক্তা সমালোচনা করেন এবং এ বিষয়ে মনোযোগী করার জন্য সমন্বিত অনার্স কোর্স চালু অথবা অনার্সের ফলাফলে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল প্রতিফলিত করার কোন পন্থা উদ্ভাবনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারেও মত প্রকাশ করা হয়।

স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে চালু রাখার সর্বসম্মত রায় দেওয়া হয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে অল্প সময়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। এতে ছাত্র-শিক্ষকগণ গবেষণার প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শেখার সুযোগ পাবেন। দেশ ও বাস্তব সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার পক্ষে সভায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় একটি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হয়। এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরী ও আন্তঃলাইব্রেরী পুস্তক ঋণদান পদ্ধতি চালু করার পক্ষে মত দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলায় পাঠ্য পুস্তকের স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে পাঠ্য পুস্তক অনুবাদের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এতে দেশী-বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিদেশী বই আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের জন্য অভিমত দেওয়া হয়।

আবাসিক সমস্যা সম্পর্কেও সভায় আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীর জন্য ক্যাম্পাস এলাকায় যত শীঘ্র সম্ভব

www.pathagar.com

বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়া দরকার বলে মত ব্যক্ত হয়। ছুটির ব্যাপারে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অপরিবর্তনীয় ক্যালেন্ডার তৈরী দরকার বলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা অভিমত ব্যক্ত করেন। বছরের মে, জুন, জুলাই এই তিন মাসকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বলে গণ্য করে উপরোক্ত ক্যালেন্ডারে গৌণ বিষয়ের ছুটি কমিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যালেন্ডারে ভর্তির তারিখ, ক্লাস আরম্ভের তারিখ ও পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

আলোচনাকারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। নবীন ও প্রবীণ সকল শিক্ষকের জ্ঞান ও গবেষণা থেকে ছাত্ররা যাতে উপকৃত হতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে যে ফাঁক পরিলক্ষিত হয় তা দূরীকরণার্থে এই দুই পর্যায়ের পাঠক্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২। উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা বিশেষভাবে সীমিত হওয়া উচিত।

৩। বিভিন্ন বিষয়ের বর্তমান পাঠক্রম যুগোপযোগী নয়। অবিলম্বে সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস করে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করা উচিত।

৪। আন্তঃবিভাগীয় ও আন্তঃঅনুষদীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। অনার্স কোর্সের সঙ্গে সাবসিডিয়ারী বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমন্বিত অনার্স কোর্স চালু করতে হবে। এ কাজের জন্য অনার্সের ফলাফলে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফলকেও প্রতিফলিত করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

www.pathagar.com

৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোর্স সিস্টেম চালু করতে হবে।

৭। স্নাতক পাস ও অনার্স পর্যায়ে ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক পদ্ধতিতে অল্প সময়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাজের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

৯। দেশী ও বাস্তব সমস্যাকেই গবেষণা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এম. এস-সি পর্যায়ের পাঠক্রমের শতকরা ৬০ ভাগই গবেষণা কার্যক্রম হওয়া উচিত। সমস্যা নিরূপণ এবং সে বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারী শিল্প সংস্থাগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন।

১০। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে। ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও আন্তঃলাইব্রেরী পুস্তক ঋণদানের পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১১। বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণার্থে একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলির সহযোগিতায় সস্তা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২। সঙ্গীত, নাটক, বিতর্ক, সাহিত্য-চর্চাসহ অন্যান্য সুকুমার বিদ্যাকে সহ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীর জন্য ক্যাম্পাস এলাকায় যত শীঘ্র সম্ভব বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন তা করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন তাঁরা যাতে সারাদিন

www.pathagar.com

ক্যাম্পাসে থাকতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যথা কাফেটেরিয়ায় স্বল্প মূল্যে খাওয়া, খেলাধূলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৪। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য একটি অপরিবর্তনীয় ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করতে হবে। এতে ভর্তির তারিখ, ক্লাস শুরুর তারিখ, পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করে দিতে হবে। মে, জুন, জুলাই এই তিন মাসকে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ বলে গণ্য করতে হবে এবং অন্যান্য গৌণ ধরনের ছুটি-ছাটা কমিয়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১

বিষয় ঃ **কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, আবাসিক সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি।**

সময় ঃ ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬

সভাপতি ঃ **অধ্যাপক এম. আই. চৌধুরী,** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান মিয়া।**

এই প্যানেলে নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসা হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দঃ সর্বজনাব মুনির আহমদ, কাজী শাহাদাত হোসাইন, মোঃ ইসহাক, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, ডঃ মোঃ নাঈমুদ্দীন, এ. কে. এম. ইমদাদুল হক তালুকদার, ডঃ কে. এম. সিরাজুল ইসলাম, হাসনা বেগম, নূরজাহান বেগম, আনোয়ারা জহির, মোঃ রমজান, এম. মঈজুদ্দীন, এম. বশিরউদ্দীন, রাজিয়া খাতুন, শফিক আহমদ ভূইয়া, অংশুমান হোর, মৌলানা আবদুস সালাম, মৌলানা আবদুল সালাম, জাহির হোসাইন, মতিয়র রহমান, মোশাররফ হোসাইন, ফজলুল হক, এম. রহমান এবং স্কুল পরিদর্শক আবদুল আজিজ সরকার ও সৈয়দ আহমদ চৌধুরী।

আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুপারিশসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

আলোচনা ঃ বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত শিক্ষাবিদগণ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সব সমস্যার সমাধানেরও ইঙ্গিত দেন। এই প্যানেল আলোচনাকারীগণের কেউ কেউ বলেন যে, পাঠক্রমে এমন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে, নৈতিক চরিত্র গঠনে

www.pathagar.com

এবং জীবিকার্জনে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে সক্ষম হয়। জীবিকা অর্জনের পন্থা হিসাবে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থা সকল শ্রেণীর বা গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চালু করা যেতে পারে। আলোচনাকারীদের অনেকে মনে করেন যে, মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম পালনে সহায়ক হতে পারে এমন বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেতে পারে।

সহপাঠক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বর্তমান কর্মসূচী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহিত্য-চর্চা, সঙ্গীত, বিতর্ক, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা, ইউ. ও. টি. সি., রোভার স্কাউটিং, গার্লস গাইড ইত্যাদি কার্যক্রম বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। দেশী খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর কথা আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেছেন এবং আবাসিক সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকদের বাসস্থান ছাত্রাবাসের সন্নিকটে হলে ছাত্রদের শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আলোচনাকারীগণ মনে করেন। কলেজগুলোতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মারাত্মক অভাব রয়েছে বলে সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। পাঠাগার, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীর পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

২। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং কলেজ পর্যায়ের পাঠক্রমকে এমনভাবে রূপ দিতে হবে যাতে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে শিক্ষাতে কাজে আসে।

৩। পাঠক্রমের বিষয় এমন হতে হবে যা জাতীয় চেতনার বিকাশ,

www.pathagar.com

মানসিক উৎকর্ষ সাধন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও জীবিকা অর্জনে সহায়ক হবে। কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

৪। নৈতিক শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। সকল ধর্ম সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৫। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, ব্যবহারিক ও জীবিকার্জনের সহায়ক করার জন্য পাঠক্রমে হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। খেতে-খামারে ও কলে-কারখানায় কাজ করাকে বাধ্যতামূলক করে তার জন্য শিক্ষাক্রমে কিছু নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।

৬। মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম পালনে সহায়ক বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা তবে পাশাপাশি ইংরেজী ভাষাও থাকবে।

৮। বাজারে প্রাপ্ত বইয়ের উপর নির্ভরশীল পাঠক্রম তৈরী করা দরকার।

৯। বর্তমানে কলেজে বিদ্যমান সহপাঠক্রমের উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য সরকারী অর্থ মঞ্জুরী দিতে হবে।

১০। শরীর চর্চা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইউ. ও. টি. সি. রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে এবং এগুলোর জন্য শিক্ষাক্রমে নম্বর বরাদ্দ করতে হবে। এসব সংগঠন চালানোর জন্য সরকারী মঞ্জুরী থাকা দরকার।

১১। ছাত্র-ছাত্রীকে দেশীয় খেলাধুলায় আগ্রাহান্বিত করে তুলতে হবে।

১২। ছাত্রাবাস ও ছাত্রী-নিবাসের দায়িত্ব একজন তত্ত্বাবধায়ক ও সহ-

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়কের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সমস্ত শিক্ষককে ছাত্রাবাস বা ছাত্রী-নিবাসের সংলগ্ন স্থানে আবাসিক সুবিধা প্রদান করে এ দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে।

১৩। আবাসিক সমস্যার আশু সমাধানের জন্য পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৪। প্রত্যেক কলেজে মিলনায়তন, ও ব্যায়ামাগার স্থাপন করতে হবে এবং গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১০

বিষয় : মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদি।

সময় : ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬

সভাপতি : ডঃ ইকবাল মাহমুদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক : জনাব তোফাজ্জল হোসেন।

এই প্যানেলে নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হতে আগত নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ: সর্বজনাব মোখলেছুর রহমান, ফিরোজা বেগম, আলতাসউদ্দীন, মোঃ নুরুল ইসলাম, কাজী আবদুল আলীম, জয়নব আখতার জলিল, লুৎফন্নেছা চৌধুরী, আবদুল বারী, আবদুল মান্নান, আবদুর রশীদ, খোরশেদ-উল-আলম চৌধুরী, ফাইজুর রহমান, সাদেকা সামাদ, নুরুল হক, মোঃ রমজান আলী, মোঃ তাজমিলুর রহমান, কে. বি. হায়দার, আঃ মজিদ, জয়নাল আবেদীন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশ সমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:

আলোচনা : আলোচনাকারীগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পাঠক্রমে অত্যধিক চাপ পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যেন জীবিকার জন্য শিক্ষার সুবিধা থাকে। ভাষার উপর প্রাথমিক পর্যায়েই জোর দিতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের কথা অনেকে বলেন। নোট বইয়ের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনাকারীরা সচেতনতা প্রকাশ করে এই মনোভাব ব্যক্ত করেন যে, আইন করে নোট বই ছাপানো নিষিদ্ধ করা হোক। সহপাঠক্রমের বিষয় বৈচিত্র্যের উপর অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

আলোচনাকারীরা পাঠক্রম প্রণয়নের সময় অধ্যয়নকাল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে পাঠ্যসূচী শেষ হতে পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব কেবলমাত্র স্কুল টেক্সট্ বুক বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে না। প্রয়োজনবোধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাঠ্যপুস্তক লেখাতে হবে। একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনার সুযোগ রাখতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় পাঠাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকাও দরকার। এর জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি থাকতে হবে। আলোচনাকারীরা শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের যাতায়তের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন আছে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। গবেষণার মাধ্যমে ছাত্র চাহিদার উপর নজর রেখে তার পরিবেশের উপর নির্ভর করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাই হবে জীবিকার্জনের সম্পূর্ণ শিক্ষা।

২। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার উপর জোর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলা ও অংক এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী ও বিজ্ঞান চালু হতে পারে। সমাজ পাঠ বাদ দিতে হবে। ধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিজ্ঞানের পরিভাষা সহজতর করতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন. নতুন করে ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠক্রম তৈরী করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে কোন প্রকার প্রশ্ন সন্নিবেশিত থাকবে না।

৩। বাজারে নোট বই প্রচলন আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে।

৪। সহপাঠক্রমকে কোনমতেই পাঠক্রম থেকে আলাদাভাবে দেখা উচিত হবে না। সহপাঠক্রম এমন হতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ঘটে। সাহিত্য-চর্চা, গান-বাজনা, বিতর্ক সভা, খেলাধূলা, স্কাউটিং, গার্লস গাইড, শরীর

www.pathagar.com

চর্চা ইত্যাদি সহপাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সহপাঠক্রমের মূল্যায়ন স্কুলেই আভ্যন্তরীণভাবে হতে পারে।

৫। পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সমন্বিত পাঠক্রমের কথা চিন্তা করে পাঠক্রমে অধ্যয়নের বিষয় সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

৬। মাধ্যমিক কোর্সে শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটি ঐচ্ছিক পাঠক্রম থাকলে অনেকে এই কোর্স শেষে প্রাইমারী শিক্ষকরূপে জীবিকার্জনে নেমে যেতে পারে।

৭। মেয়েদের পাঠক্রমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিণী হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে তারা উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারবে না।

৮। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নির্ধারণের পূর্ণ কর্তৃত্ব শুধুমাত্র টেক্সট্ বুক বোর্ডের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না, চূড়ান্ত নির্বাচনের ব্যাপারটি উন্মুক্ত রাখতে হবে। দেশের বিভিন্ন বিষয় বিশেষজ্ঞদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাঠ্যপুস্তক লেখার আহবান জানান উচিত। এর জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে একাধিক পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য।

৯। প্রত্যেক স্কুলে কমপক্ষে তিন একর জমি থাকতে হবে। পুস্তক সমৃদ্ধ পাঠাগার, খেলার মাঠ ও উপকরণ প্রত্যেক স্কুলে থাকা বাঞ্ছনীয়। কৃষি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য আবাদি জমিও থাকা উচিত।

১০। শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষকদের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১১

বিষয় ঃ **শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব।**

সময় ঃ **৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **ডঃ নাজমুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব মুজিবুর রহমান।**

এই প্যানেলে নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুলসমূহ হতে আগত নিম্ন বর্ণিত প্রতিনিধিবৃন্দঃ

সর্বজনাব ডঃ এ. কে. এম. মাসুদ, কেশবচন্দ্র ভূইয়া, শামসুল আলম, শাহজাহান মৃধা, এ. সৈয়দ ওয়ায়েস কারনী, ডঃ গিয়াসউদ্দীন আহমদ, ডঃ মোজাফফর আহমদ, ডঃ মোঃ আবদুল মালেক, আহমদ ফখরুল আলম, ডঃ খন্দকার মফিজুল মান্নান, ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, এ. এম. ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, এম. এ. তাজুল ইসলাম হাসমী, ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ডঃ মোঃ শামসুল হক, ডঃ মামুনুর রশীদ, মোঃ মিজানুর রহমান, সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসাইন, সরিৎকুমার সাহা, গোলাম সামদানী কোরেশী, মৌলানা শরীফ আবদুল কাদের, মৌলানা মোঃ ইয়াকুব শরীফ, আবদুল জলিল, মোঃ জিয়াউল হক খান ও আবদুস সামাদ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

আলোচনা ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে আগত শিক্ষাবিদ ডেলিগেটবৃন্দ উল্লিখিত বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রেখেছেন। মূল আলোচনার প্রথম ভাগে ছিল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক প্রভাব এবং এর প্রতিক্রিয়া। আলোচনাকারীরা সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখে-

www.pathagar.com

ছেন। সমগ্র আলোচনায় মূল বক্তব্যগুলি আবর্তিত হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের উপর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এতে বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা হলেও বক্তব্য কতকগুলি মৌল বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে যা আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে এবং এর দ্বারাই তরুণ শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ নির্দেশনার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোন কোন বক্তা পরিবারের এমন পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ জীবনের দর্শন সম্বন্ধে একটা সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষা পেতে পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতার কথা উল্লেখ করা হয়। সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকে ধারণা দিতে হবে। আমাদের সমাজ থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি দূর করার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেন। অধিকাংশ বক্তাই এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে স্বচ্ছ রাজনীতির ধারণা থাকবে কিন্তু সে যেন অতি সক্রিয় না হয়। ধর্মীয় প্রভাবের ব্যাপারে মত প্রকাশ পেয়েছে যে, অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সার্বজনীন নৈতিক শিক্ষার প্রসারের কথা অনেকে বলেছেন। সামাজিক মূল্যবোধকে বর্তমানের অবক্ষয়তা থেকে রক্ষা এবং শিক্ষার্থী সমাজকে এর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে অবহিত করার কথা কোন কোন বক্তা উল্লেখ করেছেন। সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে অনেকে মনে করেন যে, আজকের তরুণ সমাজ যেহেতু নিজস্ব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ সুতরাং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কি হবে সে বিষয়েও তাদের সম্যক ধারণার অভাব রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে তরুণ শিক্ষার্থীকে সঠিক ধারণা দিতে হবে।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিবেশ এমন করতে হবে যাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনের দর্শন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা সেখান থেকে পেতে পারে।

২। সমাজ সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির বিভ্রান্তি দূর করার

www.pathagar.com

জন্য তরুণ শিক্ষার্থীদের দেশের কৃষ্টির সঙ্গে
করিয়ে দিতে হবে।

৩। ছাত্রদের মধ্যে স্বচ্ছ রাজনীতির ধারণা থাকবে কিন্তু
অতি সক্রিয় না হয়। শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে
রাখতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পাঠ্যবহির্ভূ
অথচ কল্যাণকর আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদিগকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার কাজটি সব ধর্ম সমন্বয়ে একটি সার্বজনীন নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৫। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে শিক্ষার্থীকে এর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে শিখাবার আগে শিক্ষককে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে নতুন মূল্যবোধকেও স্থান করে দিতে হবে।

৬। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পাঠক্রমের অন্যতম বিষয় হিসাবে চালু করতে হবে। তাই পাঠক্রম প্রণয়নে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সংস্কৃতি যাতে একটা সার্বজনীন রূপলাভ করে শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা যেন সাংস্কৃতিক প্রভাবকে কলুষিত করতে না পারে।

www.pathagar.com

সঠিক পরিচয়

সটা যেন দূরে ত

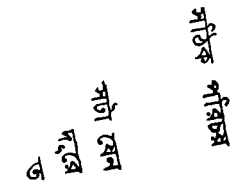

তে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের

সময় : ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬

সভাপতি : ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক : জনাব এস. এম. হোসেন।

এই প্যানেল আলোচনায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুল থেকে আগত নিম্ন বর্ণিত ডেলিগেটবৃন্দ অংশগ্রহণ করেনঃ

সর্বজনাব গোলাম রসুল, ডঃ জিল্লুর রহমান, রোস্তম আলী দেওয়ান, আখতার ইমাম, ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, রওশন আরা হক, মোহাম্মদ ফারুক, মোহাম্মদ নওয়াব আলী, আবদুস শাকুর, মৌলানা তোফায়েল আহমদ, আনওয়ারুল হক, সামসুদ্দীন মোঃ ইসহাক, মৌলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, শহীদউদ্দীন মাহমুদ, এ. বি. এম. শফিকুর রহমান, মৌলানা আবদুল জব্বার, মৌলানা ছদরুদ্দীন আহমদ, মৌলানা আবদুল গনি, দেওয়ান মোঃ আজরফ, বজলুল হক, মণীন্দ্রনাথ ও জি. এম. এ. মান্নান।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নীচে দেওয়া হলোঃ

আলোচনা : দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশকে শান্ত ও পরিচ্ছন্নরূপে গড়ে তোলার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহকে সুবিন্যস্ত ও কার্যকরী-

www.pathagar.com

রূপে ছাত্রদের মনে জাগ্রত করতে পারে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাঙ্খা আলোচনাকারীগণ ব্যক্ত করেন। তাঁরা ধর্মকে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করাকে গর্হিত এবং সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অনেকের মতে আমাদের দেশে ছাত্র সমাজের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারই ফলে সর্বত্র অস্থিরতা ও অরাজকতার সূচনা হয়েছে। এর কারণ জাতীয় জীবনে সুনির্দিষ্ট আদর্শগুলিকে আমরা দেশবাসীর মনে প্রগাঢ় প্রত্যয়রূপে এখনো সৃষ্টি করতে পারিনি। এটা করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মানবতাবোধের আদর্শকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আলোচনায় কোন কোন শিক্ষক মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি উন্নতি এবং ব্যবহারিক জীবনে উপাদানের প্রাচুর্যকে মানব জীবনের মহত্তর আদর্শের ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তাঁরা অবশ্য এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতি অপরিহার্য মানুষের জন্য তা মঙ্গলজনকও বটে। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে জীবনের উপাদানগুলিকে দ্রুত আয়ত্বের মধ্যে আনার জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও সকলের প্রতি কল্যাণের জন্য তাদের চিত্তের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে পারে। বক্তাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা সাম্প্রদায়িক চিন্তা জাগ্রত করতে পারে।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। প্রাথমিক স্তর হতে ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

২। মাধ্যমিক স্তরে ধর্মবোধ ও নৈতিক চেতনাকে বিকশিত করতে পারে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল ধর্মের উচ্চ আদর্শ, নীতি এবং মনুষ্যত্ব বিকশিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয়গুলি একত্রিত করে একটি পাঠ্যসূচী তৈরী করতে হবে।

www.pathagar.com

৪। শিক্ষাঙ্গণের মধ্যে এমন ধরনের কার্যকলাপ করতে দেওয়া হবে না এবং পাঠ্যপুস্তকে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যা কোন ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আঘাত করতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত করতে পারে।

৫। বাংলাদেশের যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খুলতে হবে।

৬। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের সম্মেলন মাঝে মাঝে আহবান করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১৩

বিষয় ঃ **শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা।**

সময় ঃ **৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬।**

সভাপতি ঃ **ডঃ সাফিয়া খাতুন,** শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব মুশতাক এলাহী।**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুল থেকে আগত নিম্নোক্ত ডেলিগেটবৃন্দঃ

সর্বজনাব মফিজউদ্দীন আহমদ, ডঃ মকবুল হোসাইন, মোকাররম হোসেন, আমিনুল ইসলাম, আবু তাহের, ডঃ হামিদউদ্দীন খান, মোঃ আসী মিয়া, ডঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, ডঃ কে. এম. মহসীন, রাজিয়া খান, মোঃ আশরাফুজ্জামান, সৈয়দা সামস-এ-আরা হোসাইন, আমিনা খাতুন, মোঃ ফজলুল করিম, সৈয়দ শফিকুল হোসাইন, এস. এম. এম. হোসাইন, গুলশান আরা বেগম, মৌলানা আবদুল মোনায়েম, মৌলানা কামালউদ্দীন, মীর রফিকুজ্জামান, হোসনে আরা আহমদ, মনোয়ারা বেগম, জাহানারা হাই, মনমোহন বর্মন, নুরুল হক।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

আলোচনা ঃ এই প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য-সদস্যার উপস্থিতিতে আলোচনার সূত্রপাত হয়। আলোচনার শুরুতেই সভানেত্রীর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ সুলতানা জামান। সভানেত্রীর প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, নির্দেশনা কার্যক্রমের সহায়তা ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা কার্যক্রম থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। মোটামুটিভাবে উপস্থিত সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন শিক্ষার মতই পর্যায়ক্রমিক স্তর হতে ছাত্র নির্দেশনা আবশ্যক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক, কিউমুলেটিভ রেকর্ড ও শিক্ষা এবং যাবতীয় কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। উচ্চ পর্যায়েও নির্দেশনা কার্যক্রমে ঐ বিষয়গুলি সবই থাকবে। শিক্ষকগণই নির্দেশনা কর্মীর ভূমিকা পালন করবেন বলে বক্তারা আশা করেন। এজন্য তাঁদেরকে আই. ই. আর. অথবা মনোবিজ্ঞান বিভাগে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্দেশনা বিষয়ক ডিগ্রীপ্রাপ্ত এ. ডি. পি. আই-র নেতৃত্বে একটি নির্দেশনা সেবক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর আলোচনাকারীগণ জোর দেন।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও জাতীয় জনশক্তি অপচয় রোধের জন্য ছাত্র নির্দেশনার অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার সকল স্তরেই ছাত্র নির্দেশনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং এর জন্য অভিভাবক শিক্ষক সমিতি বা Parents Teachers Association or P. T. A. প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। মাধ্যমিক পর্যায়ে P. T. A. ও Cumulative Record রাখা সহ ছাত্রদের কাছে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

৪। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষকই নির্দেশনা কর্মী রূপে কাজ করবেন।

৫। শিক্ষকদের হাতেই বর্তমানে নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার ভার থাকবে। এজন্য প্রতিটি স্কুল থেকে অন্ততঃ একজন শিক্ষককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ কাজের জন্য তৈরী করতে হবে।

৬। উচ্চ পর্যায়েও ছাত্রকে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

www.pathagar.com

৭। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রবণতা ও ক্ষমতার ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হবে।

৮। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা কর্ম-সূচী থাকতে হবে।

৯। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন কাউন্সিলর থাকবেন।

১০। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষককে সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে পেশাগত শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং এর মধ্যে নির্দেশনার প্রশিক্ষণও থাকবে।

১১। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল/হোস্টেলের প্রভোষ্ট, হাউস টিউটর, সহকারী হাউস টিউটর, সুপারিনটেনডেন্ট এঁদের অবশ্যই পূর্ণকালীন শিক্ষক হতে হবে এবং নির্দেশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে হলেও জ্ঞান থাকতে হবে।

১২। সহানুভূতিশীল ও নির্দেশনা দেয়ার মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের এ কাজে বাছাই করে নিতে হবে।

১৩। নির্দেশনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক স্তরে নির্দেশনার বিভিন্ন অভীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন।

১৪। সমাজের সকল স্তরে নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অভিভাবক, সমাজ সেবক ও নির্দেশনা দেয়ার মনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে স্থানীয় কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

১৫। ট্রেনিং কলেজের প্রশিক্ষণে নির্দেশনা কাউন্সেলিং কোর্স বাধ্যতা-মূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৬। ছাত্র নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী জনশিক্ষা পরিচালকের নেতৃত্বে একটা নির্দেশনা সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১৪

বিষয় ঃ **শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ভূমিকা।**

সময় ঃ **৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি ঃ **ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচনা সম্পাদক ঃ **জনাব কাজী মান্নান।**

এই প্যানেল আলোচনায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক স্কুল, প্রাইমারী স্কুল ও শিক্ষা প্রশাসনিক দফতর থেকে আগত যে সব ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেছে তাঁদের নাম নীচে দেয়া হলোঃ

সর্বজনাব এ. কে. হাজরা, মোঃ ইসা, হাবিবুর রহমান, সুনীলচন্দ্র সাধক, মোঃ শফিউল্লাহ, মোকলেসুর রহমান ভূইয়া, মোঃ মেসবাহ্উদ্দীন, ফয়জুন্নেসা বেগম, মোঃ খোদাবক্স মিয়া, আফতাবুদ্দীন, আবদুস সবুর খান, আক্কাস আলী, মোসলেহউদ্দীন আহমদ, ফজলুর রহমান, মাযহারুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, মাজেদুর রহমান বিশ্বাস, মোমেনা খাতুন, রশিদ আহমদ, সিদ্দিকুল্লাহ্ চৌধুরী, আনোয়ারুল কবির, মোঃ শামসুল হক, মোঃ মাহবুব আলম, সামসুদ্দীন আহমদ, নীহার সেন, রহিমা খাতুন, কে. এম. সাইফুল ইসলাম মনসুর মুসা, আবুল বাশার ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য আ. ফ. ম. সফিয়ুল্লাহ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

আলোচনা ঃ প্যানেলের তালিকাভুক্ত অধিকাংশ সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাকারীরা সবাই একমত যে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়,

www.pathagar.com

বরং একে অপরের পরিপূরক। সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই শিক্ষার উপযুক্ত, সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাঁরা মনে করেন যে বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণের মধ্যে দলীয় কোন্দল শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাধা দূর করে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আলোচনাকারীগণ আহবান জানান।

সুপারিশসমূহ ঃ

১। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২। অভিভাবকগণকে বেশী সচেতন হতে হবে। মহিলাদের শিক্ষাসূচীতে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা থাকতে হবে। অভিভাবকদের কর্তব্য সম্পর্কে উপযুক্ত পুস্তিকা থাকা দরকার।

৩। শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, যোগ্যতার পুরস্কার এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৪। সরকার ও রাজনীতিবিদগণকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা-সমিতি না করা, শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন অনুষ্ঠান না করা, বিশেষ ব্যক্তির সম্বর্ধনা না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষকদের নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় কোন্দল দূর করতে হবে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, স্থানীয় লোককে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা, শিক্ষকদের অতিমাত্রায় প্রাইভেট ট্যুশনী ও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ইত্যাদি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

৬। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের উৎসাহ দিতে হবে।

৭। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী যুগোপযুগী এবং পাঠ্যপুস্তকের মনোন্নয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

৮। ছাত্রদেরকে দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করা চলবে না। একই ছাত্র এক কোর্স সমাপ্ত করার পর অন্য কোর্সে ভর্তি হয়ে বৎসরের পর বৎসর হলে থাকতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক সভা-সমিতি করতে দেওয়া যাবে না।

৯। শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে সংযোগ রাখতে হবে।

www.pathagar.com

প্যানেল নং—১৫

বিষয় : **প্রাথমিক শিক্ষার মান।**

সময় : **৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬**

সভাপতি : **বেগম আজিজুন নেসা, যুগ্ম-জনশিক্ষা পরিচালক।**

আলোচনা সম্পাদক : **জনাব আশরাফউদ্দীন।**

এই প্যানেলের নির্ধারিত আলোচনাকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাইমারী স্কুল, পি. টি. ইনষ্টিটিউট, জেলা শিক্ষা দফতর ও জনশিক্ষা পরিদফতরের প্রতিনিধিত্বকারী নিম্নোক্ত ডেলিগেটবৃন্দঃ সর্বজনাব আবদুল গনি, জসিমউদ্দীন, আফতাবুদ্দীন, আবদুস সবুর খান, আক্কাস আলী, আফতাবুদ্দীন ভূইয়া, নেসারুল ইসলাম, আবদুল মজিদ, আবদুল কাদের মিয়া, নুরুল ইসলাম, নাজির হোসেন মন্ডল, কামাল, মজিবর রহমান, মাসুদুর রহমান, আবদুর রউফ, আজহারুদ্দীন, গোলাম নবী, আবুল কাসেম, আবদুল আউয়াল মিয়া, আবদুর রহমান, মোঃ মুস্তফা, আহমদ হোসেন, এ. এম. কাদের আহমদ, ময়ূরধ্বজ চাকমা, সিরাজুল হক, মোঃ রিয়াজুদ্দীন, মাহবুবুল আলম, সামসুল হক, মোঃ সোলায়মান, সেকান্দর আলী, মোঃ মোস্তাক এবং বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নীচে দেওয়া হলোঃ

আলোচনা ঃ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ডেলিগেটবৃন্দ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করেন। যদিও শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে যে, দেশের গণমানবের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যেসব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু গতিশীল

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, এই প্রাথমিক শিক্ষাই সব শিক্ষার ভিত্তি, এই ভিত্তি ভূমিকে দুর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করা, ঐ সকল স্তরের শিক্ষার মান উন্নত করা, সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও দেশের নড়বড়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কোন পদক্ষেপ এখনো নেওয়া হয়নি। তাঁরা বলেন, রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা তার কতদূর অর্জিত হচ্ছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন, পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আবশ্যিক ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হচ্ছে, প্রাথমিক স্কুলগুলো থেকে কতজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে যেতে সক্ষম হয় তা দেখা দরকার। সফলতা যদি উল্লেখযোগ্য না হয় তাহলে এই ব্যবস্থার গলদ কোথায় নির্ধারণ করতে হবে এবং তার প্রতিকারে ব্রতী হতে হবে।

আলোচনাকারীগণ উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে সার্বজনীন করার দাবী এদেশের মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ করে আসছে। সরকারী খরচে দেশের দূর-দূরাঞ্চলের গ্রামগুলিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও সেখানে ছাত্র নেই কেন,সেখানে লেখাপড়ার সুযোগের অভাব কেন? প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা দীর্ঘ দিনের, এর ফলে অপচয় হচ্ছে সরকারী অর্থের এবং দেশের জনশক্তির। এদিকে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনাকারীগণ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পর্যায়ের পাঠক্রম প্রণয়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা এই পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগী করা, প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা, নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করেন।

সুপারিশসমূহ :

১। **প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগী ও শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করা হয়।**

www.pathagar.com

২। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা এবং শিক্ষকতার জন্য নিয়মকানুন পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৩। মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে।

৪। বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫। মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন সম্ভব কিনা বিবেচনা করতে হবে।

৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যতগুলি শ্রেণী আছে কমপক্ষে ততজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

সমাপ্তি অধিবেশন
ও
সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ

- *সমাপ্তি অধিবেশনের কার্যাবরণী*
- *সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমাপ্তি অধিবেশন ঃ

সময় ঃ ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬, অপরাহ্ন ৩টা থেকে ৬টা।

সভাপতি ঃ **অধ্যাপক এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্**, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

কার্যবিবরণী

এই সেমিনারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্যানেল আলোচনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা পদ্ধতি যে সব সমস্যা ও ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে সে সমস্যা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে তার সমাধানের ইঙ্গিত দেবার জন্যই বিশেষভাবে এ সকল প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাকে পনেরটি প্যানেলে ভাগ করে সেমিনারে আগত ডেলিগেটবৃন্দকে তাঁদের শিক্ষাদান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনুসারে এই সব প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্যানেল অধিবেশনে সমস্যামূলক এই সব বিষয়বস্তুর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ডেলিগেটবৃন্দের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি প্যানেলে আলোচিত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে কতিপয় ব্যবস্থা সুপারিশ আকারে গৃহীত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অধিবেশনে প্যানেল আলো-চনার সভাপতিমন্ডলী তাঁদের স্ব স্ব প্যানেলের রিপোর্ট ও প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ পেশ করেন। অধিবেশনে এই সকল রিপোর্ট এবং সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

সভাপতির ভাষণে ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্ বলেন, দেশের শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রশাসনিক সমস্যা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরী আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, ফলে অর্থ বন্টন যথাযথ হয় না। এই সকল অব্যবস্থা দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই অর্থ বন্টন সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, কলেজের স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন ডি. পি. আই, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। ফলে একই পর্যায়ের ছাত্রগণ দুই অঙ্গনে থাকার দরুন শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পায় বিভিন্ন ধরনের, এই কারণে একই পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-ঙ্গণের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যবধান থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যকার শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান কমানোর উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সরকারের নিকট বাস্তবধর্মী প্রস্তাব পেশ করবেন।

প্যানেল আলোচনার সুপারিশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আলোচিত সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে যে সকল কর্মপন্থা সুপারিশসমূহে নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলো অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত মতামত। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যই এ সকল সুপারিশ করা হয়েছে এবং শিক্ষার উন্নত মান ও সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে এগুলোর বাস্তবায়ন একান্তই প্রয়োজন। তবে আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার প্রেক্ষিতেই এই সুপারিশগুলো বিবেচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার পর্যায় অনুসারে সুপারিশ সমূহের সার-সংক্ষেপ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের টেকনোলজিক্যাল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ করে প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমান পাঠক্রম যুগোপযুগী নয়। অবিলম্বে সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস করে যুগোপযুগী ও বাস্তবধর্মী করা উচিত।

২। প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অসঙ্গতি রয়েছে। এই দুই পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩। উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা দেশের চাহিদা অনুযায়ী সীমিত হওয়া উচিত।

৪। (ক) গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক বিভাগে এমন একজন অধ্যাপক থাকবেন যিনি তরুণ শিক্ষকগণকে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করতে পারেন।

(খ) গবেষকগণকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে। কোন শিক্ষক যেন গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদেশে স্কলার-শীপ বা ফেলোশীপ নিয়ে না যান সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(গ) রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফল জন-সাধারণকে অবহিত করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গবেষণার গুণগত মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষ কার্যক্রম প্রণয়ন করা দরকার। প্রয়োজনবোধে এই ব্যাপারে মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

(ঘ) মঞ্জুরী কমিশন বর্তমানে কোন শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা প্রকল্প দিচ্ছেন। এ ব্যবস্থা একটা সঠিক কার্যক্রমের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এম. এস-সি. পর্যায়ের পাঠক্রমের শতকরা ষাট ভাগই গবেষণামূলক হওয়া উচিত। গবেষণার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও শিল্প সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে বইয়ের অভাব দূর করার জন্য অর্থনৈতিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন করতে হবে।

৬। (ক) কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা প্রয়োজন। আন্তঃলাইব্রেরী পুস্তক আদান-প্রদান পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

(খ) দুর্লভ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ড র্জানাল ও পত্র-পত্রিকা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা ব্যয় বহুল। সেজন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

৭। (ক) বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থ না থাকায় বাংলায় শিক্ষাদান অসুবিধাজনক। পর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলায় বই লেখা উচিত। বাংলা একাডেমীর পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ আরো দ্রুততর করা উচিত।

(খ) বাংলায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্ত প্রকাশের দায়িত্ব বিশ্ব-বিদ্যালয়কেও নিতে হবে। এর জন্য বেতনসহ ছুটি দিয়ে বই লেখার কাজের দায়িত্ব শিক্ষকদের দিতে হবে।

(গ) ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা দরকারী বইয়ের বংগানুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণার্থে একটি

www.pathagar.com

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বিদেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় সস্তা পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮। (ক) ভাষা হিসেবে ইংরেজীর মর্যাদা নির্ধারণের প্রয়োজন। স্নাতক পাশ এবং অনার্স পর্যায়ে ইংরেজীকে অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখতে হবে।

(খ) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু কার্যকর ও বিধিবদ্ধ কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করার পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যাতে করে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার সুষম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক, ল্যাবরেটরীর সুযোগ সুবিধা, লেকচার নোট বা দুষ্প্রাপ্য বই এর প্রয়োজনীয় অংশ সাইক্লোষ্টাইলিং এবং ডুপলিকেটিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। কোর্স পদ্ধতিকে সফল করতে হলে শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

১০। অনার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের তিন বছর পড়াশুনা শেষ করার পর একবারে সমস্ত পত্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা একজন ছাত্রের কিম্বা ছাত্রীর মেধা নির্ণয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

১১। কোর্স পদ্ধতি চালু না করা পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের (ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের) জন্য শতকরা ৪০ এবং ফাইনাল

www.pathagar.com

পরীক্ষার জন্য শতকরা ৬০ নম্বর রাখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের উপর আরো অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার পূর্বে মাত্র কিছু-দিন লেখাপড়া করে পরীক্ষা পাশের চেষ্টা না করে সারা বছর পড়াশুনায় মনোযোগী হয়। পিরিয়োডিক্যাল ইন্টারন্যাল এসেস-মেন্টের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সারা বছর পড়াশুনা করার চাপ বজায় রাখতে হবে।

১২। (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে।

(খ) মেধা এবং যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষার মান নির্ণয়ক সংস্থার মাধ্যমে হতে পারে। এপ্টিচ্যুড টেষ্ট, অবজেকটিভ টেষ্ট ইত্যাদি পন্থার সমন্বয়ে এ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অথবা,

(২) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের ভর্তি পরী-ক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করবেন এবং ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া কাউকে ভর্তি করা হবে না।

(৩) ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে এপ্টিচ্যুড নির্ধারণের জন্য উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কলেজ ঃ

১। বেসরকারী কলেজের আর্থিক সমস্যা উন্নতমানের শিক্ষাদানের পক্ষে অন্তরায়। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বেসরকারী

www.pathagar.com

কলেজসমূহে পর্যাপ্ত সরকারী অনুদান দেওয়া অপরিহার্য।

২। কলেজসমূহে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রী পর্যায় পৃথকীকরণ আবশ্যক। ডিগ্রী কলেজে শুধু ডিগ্রী পর্যায়ের পড়াশুনা থাকবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবম ও দশম শ্রেণী যুক্ত করা যেতে পারে। অনার্স কোর্স প্রবর্তিত কলেজ-সমূহে অনার্স ক্লাশে শিক্ষাদানরত শিক্ষকদিগকে পাশ কোর্সের ক্লাশ দেয়া চলবে না।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং ডিগ্রী পর্যায়ের পাঠ-ক্রমের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রী পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে পঠনীয় বিষয়ের যেন কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্রমান্বয়ে উন্নততর পর্যায়ে পঠনীয় বিষয় উন্নততর হতে হবে এবং তাতে নূতনত্ব থাকতে হবে।

৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স চালু করতে হবে।

৫। পাঠক্রমে এমন সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা জাতীয় চেতনার বিকাশ, মানসিক উৎকর্ষ সাধন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইহা চালু করতে হবে। সকল গ্রুপেই উক্ত দুই বিষয় বাধ্যতামূলক পাঠক্রম হিসাবে থাকবে। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করতে হবে। জীবিকা অর্জনের সহায়তার জন্য হাতে-কলমে কাজ করার বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কলে-কারখানায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রচলন রাখতে হবে।

৮। কলেজ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা নির্ধারণের জন্য

www.pathagar.com

একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে। ডিগ্রী পর্যায়ে অবাধ ভর্তির বদলে মানগত ও গুণগত বিচারের মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। দেশে বর্তমানে প্রায় ছয়শত কলেজ আছে। জনসংখ্যা ও প্রশাসনিক এলাকার ভিত্তিতে এই সংখ্যা কমিয়ে এনে বসরকারী কলেজসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিজেরাই গ্রহণ করবে এবং মূল্যায়নের পর সার্টিফিকেট দিবে।

১১। শিক্ষার মান উন্নয়নের এবং বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাফল্য লাভের জন্য অনবরত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই এই পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং সেজন্য কলেজগুলোর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করতে হবে।

১২। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য প্রথম থেকে শুরু করে কলেজ শিক্ষার শেষ পর্যন্ত সাফল্য, চারিত্রিক গুণাবলী, ব্যক্তিগত গুণাবলী ইত্যাদি সম্বলিত একটি পূর্ণ বিবরণ কার্ড রাখতে হবে।

১৩। শরীর-চর্চা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইউ. ও. টি. সি. রোভার-স্কাউট, গার্লস-গাইড ইত্যাদি সকল কলেজে চালু করতে হবে এবং এর জন্য নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।

১৪। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা সমাধান করতে হবে।

১৫। কলেজগুলোতে গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগার, মিলনায়তন ইত্যাদি ব্যবস্থা অনেক কম। সরকারী সাহায্য ব্যতীত এগুলোর ব্যবস্থা ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

১৬। মেয়েদের জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে সংসারধর্ম পালন সম্পর্কিত একটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ স্কুল ও মাদ্রাসা

১। বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহে আর্থিক অনিশ্চয়তা শিক্ষার মান উন্নয়নের অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য দূর করতে হবে।

২। শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মান সম্পর্কযুক্ত। পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য পূর্ণ বেতন ও উপযুক্ত হারের প্রশিক্ষণ ভাতাসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিবেদিত প্রাণ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষককে উৎসাহিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। শিক্ষকগণের চাকুরীর স্থায়ীত্ব, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, টিচার্স বেনিফিট ইত্যাদির ব্যাপারে অন্যান্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দূর করতে হবে।

৪। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। শ্রেণীর সংখ্যা ও পাঠদানের বিষয় সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারী সাহায্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হতে হবে।

৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিষয়, তার বুঝবার ও শিখবার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

৭। বর্তমান পাঠক্রম থেকে অল্প প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়-গুলো বাদ দেওয়া উচিত। যেমন পাঠক্রম থেকে সমাজ পাঠ বাদ দিতে হবে, এর পরিবর্তে নূতন করে ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠক্রম তৈরী করতে হবে।

৮। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার উপর জোর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলা ও অংক এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী এবং বিজ্ঞান চালু করতে হবে।

৯। ধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০। (ক) পাঠক্রমকে বাস্তব জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে হবে, যাতে করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষ পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সাথে কারিগরি ও কৃষি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১১। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটা ঐচ্ছিক পাঠক্রম থাকলে অনেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের পর প্রাইমারী শিক্ষকরূপে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে পারে।

১২। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৩। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ও নির্বাচনের পূর্ণ কর্তৃত্ব শুধু টেক্সট্ বুক বোর্ডের উপর থাকা উচিত নয়। প্রতি-যোগিতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

১৫। অনেক স্কুল ও মাদ্রাসায় উপযুক্ত লাইব্রেরী, বই, বেঞ্চ, টেবিল

www.pathagar.com

ব্লাক-বোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ প্রয়োজন অনুসারে নেই। এর জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

১৬। সস্তা নোট বই এবং অন্যান্য সাহায্য পুস্তক প্রকাশ বন্ধ করতে হবে।

১৭। ল্যাবরেটরী, সাজ-সরঞ্জামের সুবিধা না থাকলে কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি দেয়া উচিত নয়।

১৮। বিভিন্ন টিচিং-এইডের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক-গণের ব্যবহারের জন্য টিচার্স ম্যানুয়েল তৈরী করতে হবে।

১৯। ছাত্র ভর্তি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার করবেন। প্রত্যেক স্কুলকে এই নীতিমালা পালন করতে হবে। ষষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বেসরকারী স্কুলসমূহ জেলা শিক্ষা অফিসারের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে।

২০। ১৯৭৩ সালের স্কুল কমিটির রেগুলেশনের আশু সংস্কার প্রয়োজন।

২১। প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা নিতে হবে। অন্ততঃপক্ষে এক বছরে ছয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২২। মাসিক পরীক্ষার এবং বার্ষিক পরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করতে হবে।

২৩। শিক্ষা বোর্ড বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় মডেল প্রশ্ন তৈরী করে বিদ্যালয়গুলোতে বিতরণ করবেন।

২৪। গ্রেস মার্কস (খয়রাতী নম্বর) দেয়া বন্ধ করতে হবে।

২৫। পরীক্ষায় সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। পরীক্ষা

www.pathagar.com

কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু করতে হবে।

২৬। সহপাঠক্রম এমন হতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ঘটে।

২৭। শিক্ষকদের বাস সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮। ছাত্র-শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজসাধ্য করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

১। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগীভাবে ও শিক্ষার্থী-দের নিকট আকর্ষণীয় করে প্রস্তুত করতে হবে।

২। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা এবং শিক্ষকতার জন্য নিয়মকানুন পুনর্বিন্যাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩। মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে।

৪। বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫। মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন সম্ভব কিনা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যতগুলো শ্রেণী আছে কমপক্ষে ততজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ

১। পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রাথমিক শিক্ষালয়। এই কারণে পরিবারের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

জীবনের দর্শন সম্বন্ধে একটা সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষা পারিবারিক পরিবেশ হতে পেতে পারে। অভিভাবকদের এই সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

২। তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচয় করে দিতে হবে তাদের সঠিক কৃষ্টির সঙ্গে। নিজেদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারলে তরুণ মনের অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি দূরীভূত হবে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত আপন কৃষ্টিকে পাঠক্রমের একটা বিষয় হিসাবে চালু করতে হবে।

৩। ধর্ম মানুষকে সামাজিক কলুষতা থেকে মুক্ত রাখার পথ নির্দেশ দেয়। তাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে অল্প বয়স থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

১। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

২। মাধ্যমিক স্তরে ধর্মবোধ ও নৈতিক চেতনাকে বিকশিত করতে পারে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল ধর্মের উচ্চ আদর্শ নীতি এবং মনুষ্যত্ব বিকশিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয়গুলো একত্রিত করে একটি পাঠক্রম তৈরী করতে হবে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ঃ

১। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নির্দেশনার অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা কর্মসূচী থাকতে হবে।

২। নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে শিক্ষক-

www.pathagar.com

দের উপর। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ একজন শিক্ষককে কাউন্সিলিং-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তিনি হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলর।

৩। কাউন্সিলিং-এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে কর্মসংস্থানের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন কাউন্সিলর থাকা উচিত। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও কাউন্সিলিং-এ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৫। ছাত্র নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটা নির্দেশনা সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং এর জন্য অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা ঃ

১। অভিভাবক-শিক্ষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকগণ যাতে পরিবেশ সৃষ্টিতে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সুযোগ পান সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সভা-সমিতি না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকার এবং রাজনীতিবিদগণকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকগণকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের সম্মেলন মাঝে মাঝে আহ্বান করতে হবে।

www.pathagar.com

৫

পরিশিষ্ট

- জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটি
- জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটি
- অনুষ্ঠান সূচী
- ব্যবস্থাপনা সহযোগী
- ডেলিগেটবৃন্দের তালিকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটি

সভাপতি

অধ্যাপক আবুল ফজল, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

সদস্য

জনাব মোঃ মুজিবুল হক, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ্, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ভাইস-চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন আহমদ, ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আবদুল করিম, ভাইস-চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ মুসলেহউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ভাইস-চ্যান্সেলর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব নূরুস সাফা, জনশিক্ষা পরিচালক।
জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা।
ডঃ খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
জনাব সা'দত হুসাইন, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সাংগঠনিক কমিটি

সভাপতি

ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য

ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ ইউসুফজাই, ডীন, পুরকৌশল অনুষদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ এ. কে. রফিকুল্লাহ্, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম, ডীন, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব কে. এ. এ. কামরুদ্দিন, ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব নূরুস সাফা, জনশিক্ষা পরিচালক।
জনাব সা'দত হুসাইন, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
জনাব মীর আনোয়ার আলী, উপ-শিক্ষা উপদেষ্টা।
ডঃ খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
জনাব সৈয়দ আহমদ, চেয়ারম্যান, স্কুল টেক্সট্ বুক বোর্ড।
জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ নূরুল হক, পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।
ডঃ কে. আলী, পরিচালক, ছাত্র নির্দেশনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মিসেস রাজিয়া খান আমীন, সহযোগী অধ্যাপিকা, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মিসেস হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা।
মিসেস মারেফা খাতুন, অধ্যক্ষা, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানসূচী ঃ

রবিবার, ৪ঠা এপ্রিল '৭৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রপতির আগমন ঃ সকাল ৯-৩০
জাতীয় সঙ্গীত।
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত।

www.pathagar.com

সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরীর ভাষণ।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের উদ্বোধনী ভাষণ।

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জাতীয় শিক্ষা সেমিনার কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবুল ফজলের ভাষণ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন।

প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা অধিবেশন

বিষয় ঃ শিক্ষার মান, স্থান ঃ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন

মাধ্যমিক শিক্ষার মান ঃ বিকাল ২-৩০ হইতে ৪টা

সভাপতি ঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ভাইস-চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধপাঠ ঃ ডঃ শামসুল হক, অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট।

আলোচনা ঃ জনাব আবদুল হালিম, অধ্যাপক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নাসিরাবাদ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

জনাব কে. বি. হায়দার, প্রধান শিক্ষক হবিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।

জনাব এ. কে. মাহফুজুল হক, চট্টগ্রাম মডেল হাই স্কুল।

চা পানের বিরতি ঃ ৪টা হইতে ৪-৩০

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার মান ঃ বিকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০

সভাপতি ঃ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ভাইস-চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধপাঠ ঃ ডঃ মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

জনাব আমিনুল হক, অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মন-সিংহ।

আলোচনা ঃ জনাব খুরশিদ আলম চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ।

www.pathagar.com

জনাব হাসান আজিজুল হক, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কলেজ ঃ ডঃ এম, এ, রকিব, অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব তাসাদ্দক আহমদ, অধ্যক্ষ, নেত্রকোনা কলেজ।

জনাব খলিলুর রহমান, অধ্যাপক, সা'দত কলেজ, করটিয়া।

সোমবার, ৫ই এপ্রিল, '৭৬

প্যানেল আলোচনা সকাল ৯টা হইতে ১টা

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা, পাঠক্রম, পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জামঃ

সভাপতি ঃ ডঃ এম, হাবীবুল্লাহ, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিঃ

সভাপতি ঃ ডঃ এ, এফ, এম, সালাহউদ্দিন, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

সভাপতি ঃ ডঃ এ, কে, এম, সিদ্দিক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলেজে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জামঃ

সভাপতি ঃ জনাব তফাজ্জল হোসেন, অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ।

কলেজে ছাত্রভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

সভাপতি ঃ জনাব আবু সুফিয়ান, অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জামঃ

সভাপতি ঃ ডঃ এ, কে, এম, আমিনুল হক, অধ্যাপক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

সভাপতি ঃ ডঃ সামসুদ্দিন মিয়া, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচচমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী।

প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা অধিবেশন

বিষয় ঃ শিক্ষার পরিবেশ, স্থানঃ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবেশঃ বিকাল ২-৩০ হইতে ৪টা।

সভাপতি ঃ ডঃ আবদুল করিম, ভাইস-চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধপাঠ ঃ জনাব শামসুল কবীর, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

www.pathagar.com

আলোচনা ঃ জনাব হাফিজুদ্দিন আহমদ, প্রধান শিক্ষক, ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।
জনাব দবিরউদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ, চাঁদপুর কলেজ।
জনাব আবদুন নূর চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক, শায়েস্তাগঞ্জ হাই স্কুল।

চা পানের বিরতিঃ ৪টা হইতে ৪-৩০ মিনিট।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশঃ বিকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০
সভাপতি ঃ ডঃ আবদুল করিম ভাইস-চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রবন্ধপাঠ ঃ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
মিসেস হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা।
আলোচনা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ডঃ জিল্লুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব স্বপন আদনান, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কলেজ ঃ ডঃ নূরুর রহমান খান, অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ। ডঃ আলী আহমদ, অধ্যক্ষ, দিনাজপুর কলেজ।

মঙ্গলবার, ৬ই এপ্রিল, '৭৬

প্যানেল আলোচনা সকাল ৯টা হইতে ১টা
বিষয় ঃ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম, সহপাঠক্রম ও আবাসিক সুবিধাদিঃ
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ঃ
সভাপতি ঃ ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কলেজ পর্যায়ঃ
সভাপতি ঃ অধ্যাপক এম, আই, চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
মাধ্যমিক পর্যায়ঃ
সভাপতি ঃ ডঃ ইকবাল মাহমুদ, অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ

সভাপতি ঃ ডঃ নাজমুল করিম, অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তাঃ

সভাপতি ঃ ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তাঃ

সভাপতি ঃ ডঃ সাফিয়া খাতুন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ভূমিকাঃ

সভাপতি ঃ ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক, চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাথমিক শিক্ষার মান ও পরিবেশঃ

সভাপতি ঃ বেগম আজিজুন নেসা, যুগ্ম জনশিক্ষা পরিচালক।

সমাপ্তি অধিবেশন

বিকাল ৩টা হইতে ৬টা

স্থান ঃ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন

সভাপতি ঃ অধ্যাপক এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

প্যানেল সভাপতি কর্তৃক প্যানেল আলোচনার বিবরণী পাঠ।

সভাপতির ভাষণ।

ব্যবস্থাপনা সহযোগী

সর্বজনাব এ. জেড. খান, ডঃ আবদুল মঈন খান, জহুরুল হক, আবদুল মান্নান খান, আজহারুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ, কামরুল আহসান চৌধুরী, গালিব আহসান খান, নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, আজিজুর রহমান, নাসীমা ফেরদৌস, আলতাফ হোসেন, এম. মোস্তফা, এ. কে. এম. সাদেক, মোঃ মুনসেফ আলী, আবু জায়েদ শিকদার, শাহাদাত আলী, মোহাম্মদ ইস্‌হাক, মাহবুবুল আলম, আলী আহমদ, শরীফুল ইসলাম, আবদুল হাই, আনসার আলী মিয়া, হারুনুর রশীদ পাঠান, ইমতিয়াজ আহমদ, শরীফা মাসুদ।

www.pathagar.com

সেমিনারে উপস্থিত ডেলিগেটবৃন্দের তালিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

সর্বজনাব ডঃ সামসুল হক, ডঃ মাযহারুল হক, মোঃ সফিউল্লাহ, ডঃ মুজাফফর আহমদ, ডঃ মোঃ আবদুল মালেক, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ কামালউদ্দিন, সুনীলচন্দ্র সাধক, মাহবুবুর রহমান, ডঃ আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, ডঃ হামিদউদ্দিন খান, মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী, এ. এম. বাকের, মোঃ আলী মিয়া, ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক, মোঃ আবদুল কুদ্দুস, এ. ফখরুল আলম, কাজী জাকের হোসেন, ডঃ এ. কে. এম. সিদ্দিক, মোঃ সুলতান আহমদ, ডঃ খন্দকার মফিজুল মান্নান, ডঃ মাহবুবুল হক, ডঃ এ. জব্বার মিয়া, ডঃ ইয়াজুদ্দিন আহমদ, ডঃ জালালুর রহমান, ডঃ এ. কে. কামালউদ্দিন, ডঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ, ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ, জপব্রত চৌধুরী, ডঃ, এম. মনিরুজ্জামান মিয়া, আমানতউল্লাহ খান, ডঃ এম. কবীর, ডঃ কে. এম. মহসীন, ডঃ এম সিরাজুল ইসলাম, সাখাওয়াত আলী খান, কে. মোস্তাক এলাহী, ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, রোস্তম আলী দেওয়ান, মঈনউদ্দিন খান, ডঃ লুৎফুল হক চৌধুরী, শান্তি নারায়ণ ঘোষ, এ. কে. এম. আবদুল আলীম, এম. এ. তাজুল ইসলাম হাসমী, ডঃ সৈয়দ লুৎফুল হক, ডঃ এম. মোস্তাফিজুর রহমান, ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, মোঃ আজিজুর রহমান খান, এম. নাসিরউদ্দিন, এম. সরওয়ার হোসেন, ডঃ নাজমুল করিম, সৈয়দ আলী নকি, সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসাইন, নুরউদ্দিন আহমদ, ডঃ মনিরুজ্জামান, মনসুর মুসা, এ. বি. এম. আখতার হোসাইন, ডঃ এ. এইচ. মঈনউদ্দিন আহমদ, ডঃ এস. এস. এম. এ. খোরাসানী, এম. কামরুল আহসান চৌধুরী, এ. জেড. শিকদার, ডঃ এ. এস. এম. নুরুল ইসলাম, খাদিজা খাতুন, ফয়জুন্নেসা বেগম, রাজিয়া খান আমীন, বেগম জাহান আরা, আকতার ইমাম, হোসনে আরা কামাল, রাজিয়া সুলতানা ও সিনেট সদস্য আ. ফ. ম. সফিয়ুল্লাহ।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

সর্বজনাব ডঃ এ. এফ. সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রীতি কুমার মিত্র, মোঃ রফিক. ওবায়দুর রহমান, ডঃ কে. এস. আহমদ, ডঃ মেসবাহউদ্দিন আহমদ, ডঃ এ. কে. এম. মাসুদ, ডঃ এম. এ. রকিব, ডঃ এম. ইমামউদ্দিন, মফিজ-উদ্দিন আহমদ, এস. কে. মুখোপাধ্যায়, মোঃ ফারুক, এম. আই. চৌধুরী, ডঃ এ. এফ. এম. কামালউদ্দিন, ডঃ দেলওয়ার হোসেন, ডঃ মকবুল হোসেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

সর্বজনাব ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, সফিউদ্দিন জোয়ারদার, ডঃ জিল্লুর রহমান. হাসান আজিজুল হক, আফতাবুর রহিম. কুদরত-ই-গুল মাহতাব আলী, সামসুল আলম, গোলাম কবির, আমিনুল ইসলাম, ডঃ এ. এন. সামসুল হক।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যাল ঃ

সর্বজনাব আইনুস নিসাত, জোবায়েদ কবির, মোঃ রেফায়েতউল্লাহ, শাহজাহান মৃধা, সৈয়দ ওয়ায়েজ কারনী, সিরাজুল হক, ডঃ গিয়াসউদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন, এ. কে. হাজরা, মোঃ ইসা, কাজী মুহম্মদ জহীরুদ্দীন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ঃ

সর্বজনাব ডঃ এ. কে. এম. আমিনুল হক, ডঃ আবদুল লতিফ মিয়া, ডঃ সামসুদ্দিন আহমদ, ডঃ এ. আর. এম. মাসুদ, সফদার আলী, আলী নওয়াজ, ডঃ আবদুর রাজ্জাক, ডঃ নুরুল ইসলাম ভূঞা, ডঃ সৈয়দ গিয়াস-উদ্দিন, ডঃ মোঃ সামসুল হক, ডঃ মামুনুর রশীদ, ডঃ সুমন দেওয়ান. ওবায়দুর রেজা, মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ আতাউর রহমান, নুর মোঃ তালুকদার, মোঃ আশরাফুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, ডঃ এ কে এম. নুরুজ্জামান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

সর্বজনাব ডঃ আর. আই. চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান. ডঃ মোঃ আব-দুল গফুর, মোঃ মিজানুর রহমান মিয়া, মাহবুবউল্লাহ, মোঃ আবদুল

www.pathagar.com

হাই, সরিত কুমার সাহা, শহীদউদ্দিন মাহমুদ, সফিকুর রহমান, মোঃ সামসুল আলম, ফজলুল হক।

জনশিক্ষা পরিচালনালয় ঃ

সর্বজনাব এ. এম. এ. রশিদ, বাকী বিল্লাহ খান, সৈয়দা জাহান আরা করিম, আনোয়ারা বেগম, নূরউদ্দিন আহমদ, এ. এন. চৌধুরী, শামসি মোমেন, আবুল খায়ের আহমদ, তাবিন্দা আকতার, জোবেদা খানম, আনোয়ার আলী খন্দকার, মোঃ খুরশীদ মিয়া, মীর আবু সালেক, এ. কে. সামসুল করিম, আবদুর রাজ্জাক, ডঃ হাফেজ আহমদ।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঃ

জনাব সামসুল কবির, মিসেস জাহান আরা খানম।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ঃ

ডঃ সামসুদ্দিন মিয়া, ডঃ সিরাজউদ্দীন।

জেলা শিক্ষা অফিসার ঃ

সিরাজুল হক, মোঃ রিয়াজউদ্দিন, মোঃ মাহবুবুল আলম, সামসুল হক।

মেডিকেল কলেজ ও ইনষ্টিটিউট ঃ

ডাঃ আজিজুর রহমান, ডাঃ এ. এম. খান মজলিস, ডাঃ এম. এ জলীল। ডাঃ নূরুল ইসলাম।

সরকারী কলেজ ঃ

খোরশেদ আলম চৌধুরী, বজলুর রহমান, নূরুজ্জামান, আমিনুল হক, ডঃ হারুন-অর-রশিদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ লুৎফর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম, এম. এ. সুফিয়ান, সাফাত আহমদ সিদ্দিকী, মোঃ আখতারুজ্জামান, ডঃ মোঃ মোসলেমউদ্দিন, ডঃ মোঃ নঈমউদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এ. কে. এম. ইমদাদুল হক মজুমদার, মোঃ আবদুল হাই, ডঃ এন. রহমান খান, নাসিম উদ্দিন আহমেদ, ডঃ খান মোঃ সিরাজুল-ইসলাম, ডঃ আলী আহমেদ, ডঃ এস. এম. আবদুর রহমান, হাসনা বেগম,

www.pathagar.com

জাহান আরা বেগম, আনোয়ারা জাহির, এ. খাতুন, সৈয়দ হেসামুদ্দিন আহমেদ এ. কে. এম. হায়দার হোসেন, নূর জাহান বেগম, মোঃ জাফর ইউসুফ, মোঃ ফজলুল করিম, মোঃ খোদা বক্স মিয়া, গোলাম রসুল, সৈয়দ সফিকুল হোসাইন, মোঃ রমজান, এস. এম মোশারফ হোসেন।

টি. টি. কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন এবং পি. টি. আই.

সর্বজনাব আবুল হাসেম, আর. সুলতানা, এলতাছ উদ্দিন, মোঃ এন. ইসলাম, মালিহা খাতুন, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, আনোয়ারুল কবির, মন মোহন বর্মন, মোঃ মহসীন, আবদুল মান্নান, মোঃ সোলায়মান, সেকান্দার আলী, মোঃ মোস্তাক।

বেসরকারী কলেজঃ

সর্বজনাব জি. এম. এ. মান্নান, আলী আহমেদ রুশদী, তোসাদ্দক আহমেদ, মোস্তায়ী বেগম, মঈজউদ্দিন, পি. এম. বসাক, এম. মোকাররম হোসেন, এম. এ. বাসার, গোলসান আরা বেগম, মোজাহিদুল ইসলাম, মোঃ এস. ওয়ার্সী, এস. হুদা চৌধুরী, অংশুমান হোর, দবিরউদ্দিন আহমেদ, টি. হোসেন, কে. কে. পাল চৌধুরী, বেগজাদী মাহমুদা নাসির, মোহাম্মদ হোসেন, মুনির আহমেদ, মারেফা খাতুন, বারীণ মজুমদার, এস. সামসে আরা হোসাইন, মোঃ আলতামাসুল ইসলাম, এম. এন. আলী, আবদুল খালেক, দেওয়ান মোঃ আজরফ, জেড. এইচ মারুফ, তৈয়েবুর রহমান, মতিয়ুর রহমান, মোশারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এম. রহমান, মিসেস এস. জে. ওয়াজিদ, মোঃ ইউসুফ, আবদুল জলিল, হোসনে আরা আহমেদ, মোসলেউদ্দিন আহমেদ, এস. এম, ইসহাক, মাজহারুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, এম নুরুল ইসলাম, এফ. আকতার বেগম, কাজী শাহাদাৎ হোসেন, শরিফা মাসুদ, মনসুর আলী মিয়া, রাজিয়া হোসেন, আজিজুল হক খান, আবদুর রশিদ ভূঞা, আবদুল হাই তালুকদার, কাজী এন. সাদাৎ, মোঃ ইসহাক, খলিলুর রহমান, আঃ হালিম, দিদারুল ইসলাম, হোসনে আরা শাহেদ।

টেকনিক্যাল এডুকেশান কলেজ, পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটঃ

সর্বজনাব এম. এ. বারি, এ. কে. আজাদ, হামিদ আলী শাহ, এম. এ.

www.pathagar.com

আজিজ, এম. এ. হালিম, এম. এ. করিম, এম. আর. হক, আবদুর রফিক, আবদুল লতিফ মন্ডল, নাফেজুর রহমান, সফিউল হক।

সরকারী স্কুল ও মাদ্রাসাঃ

সর্বজনাব ফিরোজা সুলতানা, আবদুর রশিদ মিয়া, ফিরোজা বেগম, মোজাম্মেল হক, এম. আর. বিশ্বাস, হাফিজউদ্দিন আহমেদ, বদরুননেছা আহমেদ, সামসুদ্দিন আহমেদ, জে. আকতার জলিল, লুৎফুননেছা চৌধুরী, আবদুল বারি, কাজী আবদুল মান্নান, আনোয়ারুল হক, আবদুস সাকুর, মর্জিনা হক, মোঃ রমজান আলী, মোঃ তাজমিলুর রহমান, নিহার সেন, রহিমা খাতুন, কে. বি. হায়দার, এ. মজিদ, জয়নাল আবেদিন, এ. সামাদ, আবদুল হাই, আজিজুর রব, ডঃ আইয়ুব আলী, মওলানা মোঃ ইয়াকুব শরীফ।

স্কুল পরিদর্শকঃ

সর্বজনাব আবদুল মান্নান, ইদ্রিস আলী, আবদুল আজিজ সরদার, এস. আহমেদ চৌধুরী, সাকের আহমেদ।

বেসরকারী স্কুলঃ

সর্বজনাব আবদুল জব্বার, মোঃ ইসহাক, মোঃ এম. আলী, রেয়াজুদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান, মাহমুদা বেগম, খন্দকার আবদুর রাজ্জাক, এরতাফুর হোসেন, সালেহা মাহতাব, নাসিমা হায়দার, যোগেন্দ্র চন্দ্র রায়, খন্দকার মাহমুদ আলী, নাজিমউদ্দিন ভূঞা, জালালউদ্দিন আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, হোসনে আরা বেগম, মোঃ বজলুল হক, এ. কে. এম. আমজাদ হোসেন, কে. বি. এম. সামসুল হক, মাজহারুল ইসলাম, মাহমুদা বেগম, মোঃ শাহাদাৎ আলী, মোঃ জেড হক খান, মোঃ কাদের বক্স, মোঃ মোকাররম হোসেন, মোঃ আবদুন নূর, রৌশন আরা হক, আলী আক্কাস, মোহাম্মদ উল্লাহ ভূঞা, রুহুল আমীন চৌধুরী, এ. কে. মাহমুদুল হক, চন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, রশিদ আহমেদ, শান্তিময় চাকমা, আবদুল মান্নান, আবদুর রশিদ, আবদুর রশিদ সরকার, কে. আলম চৌধুরী, ফয়জুর রহমান, নূরুল হক, আতিয়া বানু।

বেসরকারী মাদ্রাসাঃ

মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা আবদুস সামাদ, মাওঃ এ. কে. এম.

www.pathagar.com

রুহুল আমীন, মাওঃ তোফায়েল আহমেদ, মাওঃ হাজী আবদুল গণি, মাওঃ শাহ মোঃ ফারুক, মাওঃ আবদুস সালাম, মাওঃ কামালউদ্দিন, মাওঃ সদরউদ্দিন, মাওঃ শরীফ আবদুল কাদের।

প্রাইমারী স্কুলঃ

সর্বজনাব আবদুল গণি, জসিমউদ্দিন, আফতাব উদ্দিন, আবদুস সবুর খান, আক্কাস আলী, আবতাফ উদ্দিন ভূঞা, নেসারুল ইসলাম, আবদুল মজিদ, আঃ কাদের মিয়া, নুরুল ইসলাম, মোঃ নাজির হোসেন মন্ডল, কামাল, মজিবুর রহমান, মাসুদুর রহমান, এম. আলী, আজহার উদ্দিন, গোলাম নবী, আবুল কাসেম, আঃ আউয়াল মিয়া, আবদুর রহমান মোঃ মোস্তফা, আহম্মদ হোসেন, এ. এস. কাদের আহম্মেদ, ময়ুর ধ্বজ চাকমা, এবং আবুল কালাম আজাদ (প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি)।

———————

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মাননী

www.pathagar.com

প্রবন্ধ পাঠ করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

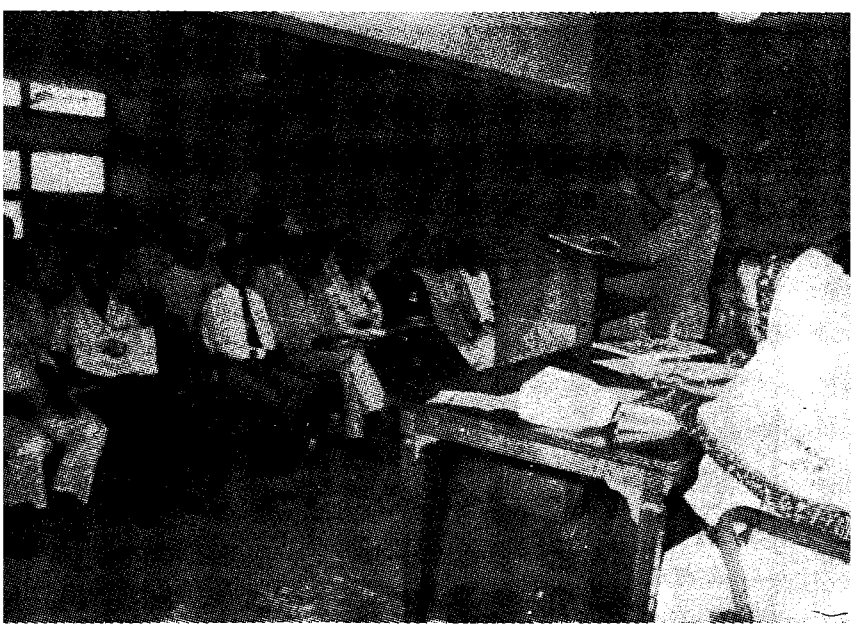

www.pathagar.com

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

www.pathagar.com